প্রথম অধ্যায়

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাসের বিষয়বৈচিত্র্য

পঞ্চাশের দশকে 'অগ্রণী সাহিত্য পত্র'-তে (১৯৫৩) প্রকাশিত 'চর' নামক ছোটগল্প দিয়ে বাংলা কথাসাহিত্যের জগতে পা রাখেন শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়। আর প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস 'বৃহন্নলা' (১৯৬১)। এই উপন্যাস মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স থেকে ১৯৭৭ সালে 'অর্জুনের অজ্ঞাতবাস' নামে প্রকাশিত হয়। লেখকের জীবদ্দশায় শেষ উপন্যাস প্রকাশিত হয় ২০০১ সালে, 'গঙ্গা একটি নদীর নাম'। ১৯৬১ খ্রি. থেকে ২০০১ খ্রি.— দীর্ঘ চল্লিশ বছর ধরে শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় বাংলা সাহিত্য জগতে বিচরণ করেছেন। এই সময়কালে তিনি আটাত্তরটি উপন্যাস রচনা করেছেন। এই উপন্যাসগুলো ছাড়াও তিনি অনেক কিশোর-উপন্যাস, কিশোর রচনা, আত্মজীবনীমূলক রচনা লিখেছেন। তাঁর আটাত্তরটি উপন্যাসই গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছে। উপন্যাসের সংখ্যাধিক্যের জন্য হয়তো উপন্যাসের গুণগত মানের হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটেছে। আয়তনের দিক থেকে সর্ববৃহৎ উপন্যাস 'শাহজাদা দারাশুকো' (দুটি খণ্ড)। তারপরেই রয়েছে 'হাওয়া গাড়ি' (দুটি খণ্ড) ও 'আলো নেই' (দুটি খণ্ড) উপন্যাস দুটি। এছাড়া নাতিদীর্ঘ ও ছোট উপন্যাসই তিনি বেশি লিখেছেন।

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় হয়তো উপন্যাসের নামকরণ নিয়ে খুব সন্তুষ্ট হতে পারতেন না। তাই দেখা যায় বহু উপন্যাসের নাম পরবর্তীকালে পরিবর্তন করেছেন। যেমন— 'বৃহন্নলা' উপন্যাসটির পরবর্তীকালে নামকরণ হয় 'অর্জুনের অজ্ঞাতবাস' নামে। 'নবকল্লোল' পত্রিকায় প্রকাশিত 'সামনে সমুদ্র' উপন্যাসটির গ্রন্থরূপ নামকরণ হয় 'একদা ঘাতক'। 'কায়কল্প' উপন্যাসটির পরিবর্তিত নাম হয় 'কঠিন সময়'। 'রূপোকুঠির পরী' উপন্যাসটির নাম পাল্টে দেন 'পরীর সঙ্গে প্রেম'। 'নতুন নগরের চিন্ময়ী' উপন্যাসটির নাম পাল্টে করেন 'ভালোবাসলে জ্বর হয়'। 'বালকের ভালোবাসা' এই নামটি পরিবর্তিত হয় 'ভালোবাসিব না আর' এই নতুন নামকরণে। এমনকি 'কুবেরের বিষয় আশয়' উপন্যাসটি প্রথমে বাসুদেব চট্টোপাধ্যায়ের ত্রৈমাসিক কাগজে 'গণেশের বিষয় আশয়' নাম দিয়ে শুরু করেছিলেন। পরে 'দেশ' পত্রিকায় যখন বের হয় তখন তিনি নাম দেন 'কুবেরের বিষয় আশয়'। শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের অনেক উপন্যাসে দেখা যায় কোনো নির্দিষ্ট ঘটনা, প্রসঙ্গ বা কোনো নির্দিষ্ট চরিত্র বারবার ঘুরেফিরে এসেছে। লেখক বলেছেন—

''ঘুরেফিরে যার কথা লিখতে চেয়েছি সে আমারই জানাশোনা একজন লোক। তার নাম শ্যামল

গাঙ্গুলী। তার মজা, তার আনন্দ। কল্পনায় তার গুলি চালানো কিংবা স্বপ্নে তার ডানা মেলে ওড়া। এই লোকটিকে কখনও সস্তার ফার্নিচারের দোকানদার হিসেবে গাঁয়ের বুনো তেঁতুল গাছ কিনতে পাঠিয়েছি। এই লোকটি খুনের বাড়ি ভাড়া নিচ্ছে। আবার এই লোকই গাঁয়ের হাতুড়ে ডাক্তার হিসেবে অভাবী তাড়িখোর মাতালের বউকে সংসার থেকে ভেগে চলে আসার পরামর্শ দিচ্ছে।"[১] নিজের কথা বিভিন্ন ভাবে লিখতে গিয়ে অনেক ঘটনা, প্রসঙ্গ ও চরিত্র উপন্যাসে তাই ঘুরেফিরে এসেছে।

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর উপন্যাসের জগতে বহু বিষয় তুলে ধরেছেন। আসলে লেখকের অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার খুব সমৃদ্ধ। লেখকের জীবন-কথা তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ। এই বিপুল অভিজ্ঞতার সঙ্গে কল্পনা মিশিয়ে উপন্যাসের যে জগৎ তিনি তৈরি করলেন তা বিষয়বৈচিত্র্যে ভরপুর। স্থানিক পটভূমির দিক থেকে মোটা দাগে তাঁর উপন্যাসগুলোকে দুটি ভাগে ভাগ করা যায়।

এক. গ্রাম ও মফস্বলকে পটভূমি করে রচিত উপন্যাস।

দুই. শহর ও নগরকে পটভূমি করে রচিত উপন্যাস।

যদিও এই দুই পটভূমি ব্যতীত বিশেষ কোনো অঞ্চলকে কেন্দ্র করেও উপন্যাস লেখা হয়েছে। এই বিষয়টি যথাসময়ে যথাযোগ্য স্থানে আলোচিত হবে। লেখকের 'চম্পাহাটি পর্ব' (১৯৬৫-১৯৭১) গ্রামজীবনের অভিজ্ঞতার আকর ভূমি। দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার চম্পাহাটিতে ১৯৬৫ সালের ১১ই অক্টোবর থেকে বসবাস শুরু করেন। গ্রামে বড়ো হয়ে ওঠা নয়, কিশোর বয়সের স্মৃতি নয়; শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় গ্রামকে দেখলেন, জানলেন, বুঝলেন একদম তরুণ বয়সে। রবীন্দ্র-শরৎ-তারাশঙ্কর-বিভূতিভূষণের দেখা গ্রামজীবন থেকে একেবারে স্বতন্ত্র গ্রামজীবন তুলে ধরলেন লেখক। এছাড়া মেদিনীপুর, হাওড়া, হুগলি, বর্ধমান, বীরভূম জেলার নানা গ্রাম ও মফস্বল অঞ্চল এবং বাংলাদেশের খুলনা জেলার গ্রামজীবন উঠে এসেছে লেখকের উপন্যাসগুলোতে। নির্বাচিত উপন্যাসের বিষয়বৈচিত্র্যের সংক্ষিপ্ত আলোচনা আমরা করব।

গ্রামজীবনকে অভিজ্ঞতা করে তাঁর লেখা প্রথম উপন্যাস 'কুবেরের বিষয় আশয়' (১৯৬৭)। বাংলা উপন্যাসে গ্রামীণ পটভূমি আমরা অনেক দেখেছি। কিন্তু সেই পটভূমিতে কুবের সাধুখাঁ-র মতো মানুষকে এই প্রথম দেখছি। নিম্নমধ্যবিত্ত যৌথ পরিবারের কুবের পরিবারের সকলকে সঙ্গে নিয়ে একটু ভালোভাবে থাকতে চায়। তাই নিজস্ব ইচ্ছাশক্তিকে সম্বল করে স্বল্প পুঁজি নিয়েই জমি খুঁজতে বের হয়। কিন্তু ধীরে ধীরে সে জমির নেশায় বুঁদ হয়ে যেতে থাকে। জমি কেনাবেচার হাত

ধরে সে প্রচুর জমির মালিক হয়ে বসে। অন্যদিকে যে পরিবারের উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে জমি কিনতে বেরিয়েছিল, সেই পরিবারের সঙ্গে তার বন্ধন শিথিল হতে থাকে। বিশেষ করে মায়ের মৃত্যু এই শিথিলতা বাড়িয়ে দেয়। আসলে কুবের যে আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে বড় হয়ে উঠেছিল, শ্রেণিগত যে মূল্যবোধ, আদর্শ, সংস্কার, বিশ্বাস ইত্যাদি তার মধ্যে গেঁথে গিয়েছিলো— তার সঙ্গে দ্বন্দ্ব লেগেছিল ড্রিম মার্চেন্ট কুবেরের। হঠাৎ শ্রেণিচ্যুতির যন্ত্রণা কুবেরকে প্রতিনিয়ত ক্ষত-বিক্ষত করেছে। কুবের তার শ্রেণিচ্যুতিকে এই বলে যুক্তিযুক্ত করতে চায় যে, ''সেজন্যেই তো লোকে বিষয়-আশয় করে—খারাপ সময়ে বিষয় থাকলে আশ্রয়ের চিন্তা থাকে না। বিষয় মানুষকে দেখে—আশ্রয় দেয়।''[২] কিন্তু এককভাবে তার উচ্চবিত্ত শ্রেণিতে প্রবেশ এবং তারপরেও পুরানো মূল্যবোধ, আদর্শ, সংস্কার, বিশ্বাস ত্যাগ করতে না পারার ফলে সে ভয়ঙ্কর একাকী, নিঃসঙ্গ হয়ে যেতে থাকে। এর ফলে সে আরও বিষয়ের মধ্যে ডুবে যেতে থাকে। বাড়তে থাকে দখলের ডিটারমিনেশন। ড্রিম মার্চেন্ট কুবের হয়ে ওঠে চক্‌দার কুবের। পরিত্যক্ত দ্বীপে (মেদনমল্লর চর) বিঘার পর বিঘা জমি দখলে রেখে চাষ-আবাদ করা। এই বিশাল কর্মযজ্ঞেও (যেখানে সে প্রায় নিজের সব সঞ্চিত অর্থ বিনিয়োগ করেছে) সে কোনও মানসিক আশ্রয় পায় না। এজন্যই হয়তো কিশোর বয়সের একটি 'স্যাড এক্সপিরিয়েন্স' তাকে এখনও তাড়া করে বেড়ায়। কারণ পুরানো মূল্যবোধগুলো তাকে তখনও খোঁচা দিয়ে যাচ্ছে। এরপর কুবের শেষ চেষ্টা হিসাবে আভাকে (ব্রজ ফকিরের স্ত্রী) আশ্রয় করে। কিন্তু আভা গর্ভবতী হয়ে পড়লে পুনরায় পুরানো মূল্যবোধগুলো দাঁত খিঁচিয়ে ওঠে। কুবের এই সমস্যার সমাধান করে আভাকে খুন করে। প্রায় সর্বস্বান্ত হয়ে দীর্ঘদিন পরে কুবের যখন কদমপুরে নিজের তৈরি করা বাড়িতে আসে, তারপরেও সে মিশে যেতে পারে না নিজের পরিবারের সঙ্গে। উচ্চবিত্ত থেকে শ্রেণিচ্যুত, নিম্নমধ্যবিত্ত থেকে শ্রেণিচ্যুত, কুবের আরও নিঃসঙ্গ, একাকী হয়ে যায়। সে নিজের তৈরি করা বিষয়ে মানসিক আশ্রয় পায় না, নিজের পরিবার থেকে আশ্রয় পায় না। এই নিরাশ্রয়তা তাকে ভুলে যাওয়া রোগে আক্রান্ত করে। কিন্তু বেছে বেছে তো জিনিস ভোলা যায় না। কুবের এরপরেও লড়াই করে। আভার বলা চাঁদের রহস্য সন্ধানে সে নিজে ব্রতী হয়। জীবন ও জগতের প্রতি এই প্রগাঢ় বিস্ময় (ভালোবাসাও বলা যেতে পারে) 'কুবেরের বিষয় আশয়' উপন্যাসকে বাংলা সাহিত্যে অনন্য করে তুলেছে।

নাগরিক জীবনকে অভিজ্ঞতা করে লেখা প্রথম উপন্যাস হলো 'অর্জুনের অজ্ঞাতবাস' (পূর্বনাম-বৃহন্নলা, ১৯৬১)। নগর জীবনে বড় হয়ে ওঠা এক যুবক (প্রথম দত্ত) কীভাবে নিজের

তৈরি ছদ্মবেশে ধুঁকছিল এবং ছদ্মবেশ থেকে তার বেরিয়ে আসার চেষ্টা— এই বিষয় নিয়েই রচিত উপন্যাসটা। কলকাতায় এক নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারে বড় হয়ে উঠেছে প্রমথ দত্ত। বাড়ির সকলেরই প্রত্যাশা সে ভালো কিছু করবে এবং বাড়ির অভাব মোচনের গুরুদায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিবে। পরিবারের অন্যান্য পুরুষেরা (বাবা, দাদা, ভাই) কিছু না কিছু উপার্জন করে। একমাত্র প্রমথ দত্তই বেকার (চাকুরি না পাওয়া) যুবক। অবশ্য সে পত্রিকায় গল্প লেখে। 'সততাই পরম ধর্ম'— ছোটবেলা থেকেই এই রকম আদর্শবোধ, বিশ্বাস দ্বারা সে আক্রান্ত। কিন্তু তাকে ঘিরে প্রত্যাশা, তার নিজস্ব জৈবিক চাহিদা এবং সমসাময়িক আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক পরিস্থিতি এক ধরনের ছদ্মবেশ তৈরি করে। এই ছদ্মবেশ মানুষের প্রকৃত রূপকে ঢেকে রাখে। ছদ্মবেশের চটকে অনেকের মুগ্ধতা, নিজেকে এক ধরনের আত্মতৃপ্তি দেয়। এরফলে নিজেও সে ছদ্মবেশের মোহে আচ্ছন্ন থাকে।

অনেক মানুষ হয়তো সেটাকে আসল রূপ ধরে সারাটা জীবন কাটিয়ে দেয়। কিন্তু সমস্যা হয় প্রমথ দত্তের মত কিছু মানুষদের, যাদের রয়েছে এক অনুভব গভীর মন। হয়তো লেখালেখির সূত্র ধরে প্রমথের এই অনুভব গভীরতা আমরা উপলব্ধি করতে পারি। বড় হয়ে ওঠার সময়ে যে মূল্যবোধ, বিশ্বাস আঁকড়ে ধরেছিল; সেই বিশ্বাস, সংস্কার তার বর্তমান জীবনের যাপন পদ্ধতির সঙ্গে মেলাতে পারছিল না। এখান থেকেই সংকট শুরু হয় প্রমথ দত্তের। সে প্রেম করে কিন্তু ভালোবাসে না। অনেক নারীসঙ্গ করেও সে কাউকে ভালোবাসতে পারেনি। কারণ ভালোবাসার জন্য পরস্পরের প্রতি যে বিশ্বাস, সততা থাকা প্রয়োজন— তার অভাব ছিলো প্রমথের মধ্যে। তাই চাকরি প্রমথর প্রকৃত প্রতিবন্ধক নয়, নিজের মিথ্যা স্বরূপ প্রকৃত ভালোবাসার জন্য প্রকৃত প্রতিবন্ধক হিসাবে উঠে আসে। আরও বিশ্লেষণ করলে বলা যায় যে, আসলে এই প্রতিবন্ধকতা হলো পুরানো সংস্কারের সঙ্গে ছদ্মবেশের আমদানি করা সংস্কারের। যেখানে আবার প্রবলভাবে কাজ করেছে প্রমথ দত্তের জৈবিক চাহিদা ও সমসাময়িক যুগ-পরিস্থিতি। ছোটবেলায় আঁকড়ে ধরা বিশ্বাস তার সংস্কারে পরিণত হয়ে গেছে, মনের মধ্যে দৃঢ়ভাবে প্রোথিত হয়ে গেছে। তাই প্রমথ দত্তের সৎ হতে চাওয়া লাইনটি উপন্যাসে বারবার ঘুরে ফিরে এসেছে। দুই সংস্কারের দ্বন্দ্বে ক্ষত-বিক্ষত হতে হতে সে হঠাৎ অনুভব করে সে ছদ্মবেশে ধুঁকছে।

আসলে আমাদের এই প্রমথ দত্তকে মনে হয় কুবের চরিত্রেরই নগর জীবনের প্রেক্ষাপটে অবিবাহিত যুবক চরিত্রের সংস্করণ। এই কাহিনির শেষদিকে অবশ্য প্রমথ দত্তর বিয়ে হচ্ছে। কুবের দ্বন্দ্বে ক্ষত-বিক্ষত হতে হতে শেষে চাঁদের রহস্য সন্ধানে (জীবন ও জগতের প্রতি প্রগাঢ় বিস্ময়)

ব্রতী হয়, প্রমথ দত্তও বীথিকে অবলম্বন করে ছদ্মবেশ থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করে। তাই আমরা দেখি প্রমথ দত্ত শেষপর্যন্ত বীথিকে বিয়ে করে। বীথির গলায় অনুভব করেছে জঙ্গলের স্বর বা বনের। জঙ্গল বা বন আমাদের কাছে আদিম জীবনের ইঙ্গিত বহন করে নিয়ে আসে। এই আদিম জীবন অবশ্য প্রতীকী অর্থ বহন করছে। আদিম জীবনের সরলতা, সততা ইত্যাদি বিষয়কে প্রতীকায়িত করে জঙ্গলের স্বর। নাগরিক জীবনের কৃত্রিমতা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য প্রমথ দত্তের এই চেষ্টাই বৃহন্নলার ছদ্মবেশ বা অজ্ঞাতবাস থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা। এটাই 'অর্জুনের অজ্ঞাতবাস' উপন্যাসের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়।

'অনিলের পুতুল' (১৯৬৩) উপন্যাসে আমরা দেখতে পাই মৃত্যু, দম্ভ, শোক, অসুখ এবং ওষুধ কীভাবে পাশাপাশি বাস করে। উপন্যাস শুরু হচ্ছে তরঙ্গিণীর আসন্ন মৃত্যু সম্ভাবনার ইঙ্গিত দিয়ে। তখন থেকেই শোকের পরিবেশ ছেয়ে যেতে থাকে সবার মধ্যে। তারপর তরঙ্গিনীর মৃত্যু এই পরিবেশকে আরও ঘন করে তোলে। এখানেই শেষ নয়, অনিলের পরিবারে মায়ের দীর্ঘকালীন অসুখ (যার জন্য প্রথম দিকে তার বড় বোনের মৃত্যু সংবাদ তাকে দেওয়া হয়নি) ও বউয়ের মাঝে মাঝেই অসুখে ভোগা, অনিলকে বিপর্যস্ত করে তোলে। কারণ সে যে আয় করে, তাতে সংসার চালাতে গিয়েই তাকে হিমশিম খেতে হয়। তার উপর অসুখের এভাবে নিত্যসঙ্গী হয়ে ওঠা। এরফলে সঠিকভাবে চিকিৎসাও হয় না অনিলের মা (সেজো) ও তার বউ (পুতুল)-এর। কিন্তু অনিলের মায়ের বাবা যে আর্থিক সাফল্য পেয়েছিল (যদিও নীতিবোধ বিসর্জন করে) তাই নিয়ে তার মা, মাসী, মামাদের যে গর্ব, দম্ভ ছিল তা কালক্রমে অন্তঃসারশূন্য প্রমাণিত হয়েছে। বাবার কাছ থেকে উত্তরাধিকারী সূত্রে তারা পেয়েছিলো মিথ্যা দম্ভ ও বড়লোক হবার উচ্চাশা। তাদের বাবা সুযোগ্য পাত্র খোঁজার বদলে কুলীনত্বকে গুরুত্ব দিয়েছে। তবে কুলীনত্বকেও ছাপিয়ে গিয়েছে টাকা বাঁচানোর প্রকৃত উদ্দেশ্য। তাই মনে হয় কয়েকটি বিয়ে প্রায় ঘরোয়া পুজোর মতো নম নম সেরে ফেলা হয়। এরফলে কোনো মেয়েই আর্থিক সঙ্গতিসম্পন্ন ছেলে পায়নি।

এই নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারে অনিলকুমার রায়চৌধুরী বড় হয়ে উঠেছে। নিজের পরিবারের সামগ্রিক বাস্তব অবস্থা তাকে ক্রমশ পীড়িত করে। সে ভয় পেতে শুরু করে বাস্তব বা কল্পিত সব ধরনের রোগকে। মৃত্যুও তার কাছে এত ভয়ের না, কারণ তা নিজের বা অন্যের সব ধরনের কষ্ট থেকে রেহাই। এই পারিবারিক অবস্থা অনিলের সমস্যাকে আরও গভীর করে তোলে ব্যক্তি অনিলের সমস্যা। জৈবিক চাহিদা ও মানসিক চাহিদা তাকে অনেকের মাঝে নিঃসঙ্গ করে দেয়। ফলে নিজের

সম্পর্কে কল্পিত রোগের কথা চিন্তা করে আরও বেশি ভয় পেতে শুরু করে। এই ভয় তার স্বপ্ন-সাধ-আকাঙ্ক্ষার বড় প্রতিবন্ধক হয়ে ওঠে। চরিত্রের পলায়নী মানসিকতা শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাসে কখনও দেখা যায়নি। তাই অনিলের যখন মনে হয় তার বাড়ির সিঁড়ি থেকেই 'পৃথিবীটা কঠিন হতে আরম্ভ করেছে', তখন সেই কঠিন রাস্তা থেকে লেখক সৌন্দর্য টেনে বের করে আনেন। জীবনের প্রতি প্রগাঢ় ভালোবাসা না থাকলে এটা সম্ভব নয়। যখন রাস্তা সহজ হবার উপায় দুরতিক্রম্য, তখন কঠিন রাস্তাকেই জড়িয়ে ধরো। তাতে রাস্তা সহজ না হলেও চলতে গিয়ে থেমে পড়তে হবে না। মানসিকতার এই গড়ন শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের অনেক চরিত্রের মধ্যে দেখতে পাই। অনিল তার মধ্যে ব্যতিক্রম নয়। তাই, ''সকালবেলা অনিলকুমার রায়চৌধুরীর কলকাতার পথঘাট ভালো লাগছিল। আজ পষ্ট শুনতে পাচ্ছিল, তার বুকের মধ্যে মাংসের ধাপ বেয়ে রক্তের ফোঁটা টুংটাং শব্দ করে গড়িয়ে নেমে আসছে। অথচ এই ট্রাম লাইন পথ কত টেকসই লাগছিল কদিন ধরে— পৃথিবী নাকি এখানে থেকেই কঠিন হতে শুরু করেছে।''[৩] জীবনের প্রতিকূলতার প্রতি এই খোঁচা দিয়েই এগিয়ে চলে শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের চরিত্ররা।

আমরা সকলেই জানি যে, বাংলাদেশ নদীমাতৃক। হয়তো এই কারণেই অনেক প্রথম শ্রেণির লেখকের লেখায় প্রাধান্য পেয়েছে নদী। অবশ্য শুধু নদী নয়, নদী তীরবর্তী মনুষ্য-জীবনও হয়ে উঠেছে তাদের লেখনীর বিষয়। বাংলা উপন্যাসের সূচনালগ্ন থেকে আজ (একুশ শতক) পর্যন্ত এই ধারা নদীর মতোই বহমান। আমাদের আলোচ্য শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাসের সম্ভারেও নদী ও নদী তীরবর্তী জীবন বিষয়টি বিদ্যমান। এই বিষয়কে কেন্দ্র করে তিনি যে উপন্যাসটি (একমাত্র) লিখেছেন, সেটি হলো 'গঙ্গা একটি নদীর নাম' (২০০১)। লেখকের জীবদ্দশায় প্রকাশিত শেষ উপন্যাস। গঙ্গা নদী ও পার্শ্ববর্তী জীবন (কলকাতা ও তৎসন্নিহিত অঞ্চল) সম্পর্কে লেখক বলেছেন, ''গঙ্গা নদীর স্বভাব চরিত্রই এখানকার মানুষের ইতিহাস, সভ্যতা। গঙ্গার জন্যেই কলকাতার রাজধানীতে প্রমোশন। গঙ্গার জন্যই পাটকল। ... কলকাতাকে ঘিরে— গঙ্গাকে কোনো না কোনোভাবে ছুঁয়ে পঞ্চাশ ষাট মাইল জুড়ে এমন জমজমাট হাসি কান্না, ঝগড়াঝাটি, ভালোবাসার ভেতর গাদাগাদি করে দু'তিন কোটি মানুষ মহামজায়-মহাদুঃখে-মহাআহ্লাদে কাজকর্ম করছে— ঘুমোচ্ছে-খাচ্ছে দাচ্ছে-অসুখে ভুগছে-নামাজ পড়ছে, ঠাকুর ভাসান দিচ্ছে— ভোট দিচ্ছে— গোহাটায় বলদ কিনছে— তাঁত বুনছে— ট্রানজিস্টরে গান, খবর সব শুনে যাচ্ছে— খবরের কাগজ পেলেও পড়ে ফেলছে— শীতে ধানকাটা মাঠে যাত্রা শুনছে।''[৪]

গঙ্গা নদী যেখানে ভাগীরথী থেকে হুগলী নাম নিয়েছে মূলত সেই অঞ্চলের (কালীনগর, মৌভাসা, উলুবেড়ে, আছিপুর ইত্যাদি) মানুষজন নিয়েই এই উপন্যাসের কাহিনি গড়ে উঠেছে। তবে এই উপন্যাস বিশেষ কোনো গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়কে বিশেষভাবে আলোকপাত করেনি। উপন্যাসের প্রধান চরিত্র হাজরা হালদার। স্ত্রী, সাত মেয়ে ও এক ছেলে নিয়ে তার দরিদ্র সংসার। গঙ্গা তার একদা বিচরণ ভূমি ছিলো। বার্ধক্যজনিত কারণ এবং অর্থের অভাব তাকে কাজ ছাড়তে বাধ্য করে। মানুষ কখনও কখনও জীবিকার সঙ্গে এমনভাবে মিশে যায় যে, সেই জীবিকা ত্যাগ করলেও মানুষের চিন্তা-ভাবনার সঙ্গে তা আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে থাকে। হাজরা হালদার সেই ধরনের চরিত্র। বড় গাঙে ইলিশ মাছ ধরার স্বপ্নকে হাতিয়ার করে সে পুনরায় ঘুরে দাঁড়াতে চায়। নিজের সম্মান বৃদ্ধি, আর্থিক সঙ্গতি ও বার্ধক্যে আর্থিক নিরাপত্তা— এই স্বপ্নের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে মিশে যায়। স্বপ্নে বুঁদ হয়ে থাকা হাজরা বড় গাঙে ইলিশ ধরতে গিয়ে তার বাস্তব বুদ্ধি ও সংযমের অভাব ধরা পড়ে। মানুষকে তার কৃতকর্মের ফল ভোগ করতে হয়। ফলস্বরূপ হাজরার স্বপ্নের সলিল সমাধি ঘটে সেই নদীতেই। এভাবেই লেখক যেন এখানে দেখাতে চেয়েছেন একটি নদীকে ঘিরে কতজনের কত স্বপ্ন জন্ম নেয়, আবার সেই নদীতেই স্বপ্নের অপমৃত্যু ঘটে। তারপরেও অবশ্য স্বপ্ন দেখা বন্ধ থাকে না। কারণ জীবন তো চলমান, তাই স্বপ্নও জীবনের সঙ্গে চলমান।

গঙ্গার ওপারে বেলুড়ের একটি ইস্পাত কারখানায় প্রথম কর্মজীবন শুরু হয় শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের। প্রায় তিন বছর ধরে ন্যাশনাল আয়রণ অ্যাণ্ড স্টিল কোম্পানির ওপেন হার্থ ফারনসে তিনি কাজ করেছিলেন। এখানে কাজ করার অভিজ্ঞতাই 'নিবার্ন্ধব' (১৯৭২) উপন্যাসের প্রেক্ষাপট হিসেবে কাজ করেছে। উপন্যাসের মূল বিষয় হলো সঙ্গহীনতায় ভোগা নিঃসঙ্গ নায়কের সঙ্গ-ভালোবাসা অন্বেষণ। উপন্যাসের প্রধান চরিত্র নিবারণ পাকড়াশি। কিছুটা নিজস্ব লড়াই এবং কিছুটা অনিল দত্তের আনুকূল্যে (কর্মক্ষেত্রের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ) বর্তমানে সে মোটামুটি সফলভাবেই প্রতিষ্ঠিত। সুন্দরী সংসারী স্ত্রী (রেবা), বড় বাড়ি, গাড়ি (ড্রাইভারসহ) নিয়ে নিবারণের সংসার সাজানো। কিন্তু তারপরেও সে সুখী নয়, তৃপ্ত নয়। অবশ্য মানুষ সাধারণত জীবনের কোনো অবস্থাতেই সুখী বা তৃপ্ত হয় না। কিন্তু নিবারণের সমস্যা অন্য জায়গায়।

উপন্যাস শুরু হচ্ছে আদালতে একটি মামলার শুনানির মধ্য দিয়ে। নিবারণ খুনের আসামী হিসেবে অভিযুক্ত। খুন হয়েছে নিবারণের অফিসের অফিসার অনিল দত্ত। সে আবার নিবারণের ঘনিষ্ঠজন হিসেবে পরিচিত। যদিও খুন লুকোবার কোনও চেষ্টা আমরা নিবারণের মধ্যে লক্ষ্য করি

না। তার সহজ স্বীকারোক্তি, সে অনিল দত্তকে খুন করেছে। অবশ্য খুন করার কোনও অভিপ্রায় নিবারণের ছিলো না। যখন বিচারক তার কাছে জানতে চায়, সে কেন খুন করেছে? এর উত্তরে নিবারণ জানায়, ''উপায় ছিল না হুজুর।

কিসের?

আমি যে অনিলের আত্মার হদিশ পেয়ে গেছি স্যার। পরিষ্কার দেখতাম ওর বুক ফুটো হয়ে নীলচে আলো উথলে পড়ছে।''[৫]

বুক ফুটো করে বেরিয়ে আসা আত্মার নীল আলোর এই অন্বেষণই নিবারণকে সুখী করে না বা তৃপ্ত হতে দেয় না। কারণ ক্রমাগত তার অন্বেষণ চলতে থাকে। কিন্তু সফলতা সে কোনওখানেই পায় না। এরজন্য সে বিভিন্নজনের সঙ্গে মেলামেশা করে। স্ত্রী রেবার সঙ্গে অনেকদিন মেলামেশা করেও সে আত্মার নীল আলোর হদিশ খুঁজে পায়নি। স্ত্রীকে বড় বেশি সাধারণ, আর পাঁচজন স্ত্রীর মত লাগে তার। যার ভালোবাসার জন্যে নিজস্ব কোনও উদ্যোগ নেই, উদ্যম নেই। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ভালোবাসার সম্পর্কটা রেবা দেখে প্রথামাফিক ভালোবাসার সম্পর্ক হিসেবে, সামাজিক আর পাঁচ-দশটা নিয়মের মতো।

স্ত্রী ব্যতীত নিবারণ তার বন্ধুদের সঙ্গেও মেলামেশা করে। বন্ধুরা যাতে তার সঙ্গে বেশি করে সময় কাটায়, সেই জন্য নিবারণ প্রচুর অর্থ খরচ করে। এমনকি তার সঙ্গে মেশার জন্যে অর্থ দিতেও সে প্রস্তুত থাকে। মদ্যপানের প্রতি কোনও আসক্তি না থাকা সত্ত্বেও বন্ধুদের সঙ্গে বসে নিয়মিত মদ্যপান করে, তাদের সঙ্গে নিষিদ্ধ পল্লীতে যায়। কিন্তু এত কিছু করার পরেও সে ব্যর্থ হয়। এছাড়াও আরও দু'জন মানুষের ওপর তার অন্বেষণ প্রক্রিয়া চালায়। একজন লতা (বন্ধু মাখনের স্ত্রী) ও অন্যজন অনিল দত্ত। লতার কাছে নিবারণের এই অন্বেষণ তার প্রেমে হাবুডুবু খাওয়া অন্য অনেক পুরুষের মধ্যে এক পুরুষের আকাঙ্ক্ষা হিসাবেই দেখে। অন্যদিকে অনিল দত্তের মনে হয় নিবারণ কর্মক্ষেত্রে উন্নতির জন্য বা আরও বেশি আনুকূল্য পাবার জন্য তাকে 'তেল' (তোষামোদ) দেয়। অন্যদের ভাবনাকে নিবারণ খুব একটা পাত্তা দেয় না। কারণ তার এক ও একমাত্র লক্ষ্য ছিলো, যে কোনো উপায়ে ভালোবাসার নীল আলোয় অন্তত একবার স্নাত হতে। এই লক্ষ্য পূরণের জন্য সে সবকিছু করতে প্রস্তুত। তাই একরাতে অনিল দত্তের সঙ্গে সময় কাটাতে গিয়ে সে আবিষ্কার করে অনিল দত্তের বুক ফুটো করে বেরিয়ে আসছে আত্মার নীল আলো। ভালোবাসার সেই নীল আলোতে স্নান করবার লোভ নিবারণ সামলাতে পারেনি। তাই আলোর বেরিয়ে আসার পথ পরিষ্কার

করতে গিয়ে অনিল দত্তের বুকের বাঁদিকে একটা টেব্‌ল ফর্ক বসিয়ে দেয়, মৃত্যু হয় অনিল দত্তের। আদালতে নিবারণ খুনের স্বীকারোক্তি দিলেও তার ভাবনাচিন্তা বিচারকের কাছে অপ্রকৃতিস্থ মনে হয়। তাই মেডিক্যাল বোর্ডের সামনে তাকে উপস্থিত হবার নির্দেশ দেওয়া হয়। যদি ডাক্তাররাও তাকে অপ্রকৃতস্থ সাব্যস্ত করে তাহলে নিবারণ খুনের শাস্তি থেকে মুক্তি পাবে। এখানেই উপন্যাসের সমাপ্তি ঘটেছে। যে সঙ্গ-ভালোবাসার অন্বেষণ নিবারণ পাকড়াশির মূল লক্ষ্য ছিলো তা অনিল দত্তের কাছে এসে সফলতা লাভ করেছে। অনিল দত্তের সঙ্গসুখ নিবারণের স্মৃতি বা স্বপ্নে তাকে আচ্ছন্ন করে রাখে। সঙ্গ-ভালোবাসার প্রতি তীব্র আকাঙ্ক্ষা শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের অনেক উপন্যাসেই বারে বারে এসেছে।

'পরস্ত্রী' (১৯৭১) উপন্যাসে অধ্যাপক জগদীশ রায়ের চরিত্রের মধ্যেও আমরা সঙ্গ-ভালোবাসার অন্বেষণকে দেখি। বর্তমানে জগদীশ রায় একজন প্রতিষ্ঠিত সফল মানুষ। কর্মক্ষেত্রে তার সুনাম রয়েছে। বাড়িতেও পারিবারিক সদস্য হিসেবে, স্বামী হিসেবে কর্তব্যনিষ্ঠ, দায়িত্বপরায়ণ। স্বামী জগদীশের প্রতি স্ত্রী হিসাবে দেবীর সেরকম কোনো অভিযোগ নেই। কিন্তু এই নিস্তরঙ্গ সাংসারিক ও কর্মজীবন জগদীশ রায়ের ইচ্ছা, আকাঙ্ক্ষা, সাধকে নিঃশেষ করে দিচ্ছে। তাই সে বলে, ''আমি রোজ ভেতরে ভেতরে শুকিয়ে যাচ্ছি। আমি অনেক কিছু করতে পারি। আমার অনেক কিছু করার আছে। আমাকে পেছন থেকে বারবার বলতে হবে— বাক্ আপ, বাক্ আপ জগদীশ— তাহলে আমি রেসের এক নম্বর ঘোড়ার চেয়েও আগে আগে ছুটতে পারি।''[৬] আসলে জগদীশ রায় থেকে অধ্যাপক জগদীশ রায় হবার যাত্রাপথ তার জীবনে ঘটনাবহুল, তরঙ্গে আন্দোলিত। লেখকের অনেক উপন্যাসে তার প্রধান চরিত্রেদের মধ্যে সৎ হবার প্রবণতা লক্ষণীয়। এই উপন্যাসেও আমরা তা দেখতে পারি জগদীশের মধ্যে। জগদীশ রায় জীবনের প্রথম দিকে নানা অসামাজিক কাজে যুক্ত হয়ে পড়েছিল। তার আগে প্রেমে বারবার প্রত্যাখ্যাত হয়েছে সে। প্রত্যাখ্যানের আঘাত জগদীশকে জীবন সম্পর্কে একটি কঠিন শিক্ষা দিয়ে যায়, একমাত্র ভালোবাসাই ভিক্ষে করে পাওয়া যায় না।

জগদীশ রায়ের একটি বড়ো বৈশিষ্ট্য হলো বিস্মৃত হওয়া। প্রত্যাখানের ধাক্কা কাটিয়ে নতুন ভাবে জীবন শুরু করে সে। কিন্তু ধীরে ধীরে বিভিন্ন অসামাজিক কাজে জড়িয়ে যায়। এই সব কাজের চাঞ্চল্যই তাকে ভালোবাসার অন্বেষণ থেকে দূরে সরিয়ে রাখে। এরপরই তার মধ্যে সৎ হবার প্রবণতা জেগে ওঠে। হয়তো তথাকথিত অসৎ কাজে নিজেকে ডুবিয়ে দেবার ফলেই জলের উপরে মাথা ভাসিয়ে নিশ্বাস (সৎ হবার ইচ্ছা) নেবার ইচ্ছা জোরাল হয়। তবে এই পথের কাঠিন্য

তাকে হয়তো ভালোবাসার অভাব অনুভব করতে দেয় না। কিন্তু যখন সে প্রতিষ্ঠিত জনপ্রিয় অধ্যাপক হয়ে উঠলো এবং সংসারের স্বচ্ছলতা, ভবিষ্যৎ জীবনের ইনসিওরেন্সের নিরাপত্তা, স্বামীভক্ত স্ত্রী, পোষ্য গরু ও মুরগি নিয়ে সুখী গৃহকোণের আয়োজন সম্পূর্ণ তখন জগদীশের জীবন হয়ে উঠলো অনেক শান্ত, সুস্থির ও প্রায় তরঙ্গহীন।

এই আপাত তরঙ্গহীন জীবনে ধীরে ধীরে নিস্তেজ হতে শুরু করে জগদীশ। তার অনুভবে ধরা পড়ে নিজের সম্পর্কে তারই আবিষ্কৃত এক তথ্য। সবাই তাকে পছন্দ করে কিন্তু কেউ ভালোবাসে না। জীবনের স্বাদ পান্‌সে হতে থাকে তার। লেখকের কাছে সবসময় গুরুত্ব পায় ভালোবাসাযুক্ত সঙ্গ। তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলোও এই ভালোবাসাযুক্ত সঙ্গের তীব্র আকাঙ্ক্ষা নিয়ে বেঁচে থেকেছে। এই অন্বেষণই মানুষের জীবনকে অনেক বেশি অর্থময় করে তোলে। উপন্যাসে দেখি পৌঢ় জগদীশের জীবনে প্রবেশ ঘটে তারই বাড়িতে আশ্রিতা মালতীর। জগদীশের কাঁধে দায়িত্ব বর্তায় মালতীর স্বামী সুকুমারকে নিজের পায়ে দাঁড়াতে সাহায্য করা। কিছুটা অনিচ্ছা সত্ত্বেও এই দায়িত্ব নেবার পর থেকে মালতীর প্রতি জগদীশের আকর্ষণ বাড়তে থাকে। মালতী বিষয়টি মন থেকে মেনে নিতে না পারলেও তার ও বিশেষ করে সুকুমারের ভবিষ্যতের কথা ভেবে নিশ্চুপ থাকে। জগদীশের ভালোবাসাযুক্ত সঙ্গ পাবার সঙ্গে সঙ্গে কাজ করে দখলের ইচ্ছা, অন্য প্রজন্মকে নিবিড়ভাবে জানার ইচ্ছা, নতুনত্বের প্রতি আকর্ষণ ইত্যাদি। মালতীর সঙ্গে সম্পর্কের টানাপোড়েনে সে শেষপর্যন্ত অনুভব করে জোর করে কখনও (এমনকি ভিক্ষে করেও) ভালোবাসা পাওয়া যায় না। কোনও তুক-তাক্, ঝাড়-ফুক্, মাদুলি, বশীকরণ মন্ত্রের মধ্য দিয়েও পাওয়া যায় না। ভালোবাসা খুঁজে নিতে হয়, আবিষ্কার করতে হয়। আর তা করতে হয় হয়তো আমাদের দৈনন্দিন যাপন থেকেই। অধ্যাপক জগদীশ রায় দৈতরির (বাড়ির ভৃত্য) গ্রামে গিয়ে দেখে তার স্ত্রী আজুবাঈ দৈতরির কাছে ফিরে এসেছে (দৈতরির স্ত্রী দৈতরির ভাইয়ের সঙ্গে একসময় ঘর ছেড়েছিল) কোনওরকম মাদুলি-কবচ-মন্ত্র ছাড়াই। আসলে ভালোবাসার মানুষকে দখলে রাখার জন্য, বশ করার জন্য, আটকে রাখার জন্য অন্য কোনও কিছুর দরকার হয় না; শুধু ভালোবাসা ছাড়া। জগদীশ রায়ের এই অনুভবগুলো স্ত্রী দেবীকে নতুন ভাবে আবিষ্কার করতে সাহায্য করে। আর দেবীর মধ্যেও একটি সুন্দর ভালোবাসার সম্পর্ক তৈরি করার ক্ষেত্রে যতটুকু খামতি ছিল (মনে হয় মালতীর পরামর্শে), সেটা দূর করার জন্য সচেষ্ট হয়। এভাবেই ভালোবাসার একটি রূপ দেখিয়ে উপন্যাসটি শেষ হয়।

বাংলাদেশের স্বাধীনতার প্রেক্ষাপটে লেখা শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের একমাত্র উপন্যাস

'ফিরোজা' (১৯৭৪) । উপন্যাসের পটভূমি খুলনা শহর। সদ্য বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে। স্বাধীন হবার আট-নয় মাস আগে লুৎফর (আওয়ামি লিগের M.L.A) ও তার দ্বিতীয় স্ত্রী ফিরোজা সন্তানসহ কলকাতায় পালিয়ে এসেছিল। স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর লুৎফর স্ত্রী-সন্তানসহ বাংলাদেশে ফিরে যাচ্ছে। এদের সঙ্গে রয়েছে লুৎফরের বাল্যবন্ধু খোকন যে ভারতবর্ষ স্বাধীন হবার পরপরই ভারতে চলে আসে। নিজের জন্মভূমিকে দেখার আকাঙ্ক্ষা নিয়েই খোকন সঙ্গী হয় ওদের। কৈশোরের স্মৃতি খোকনের মনে বারবার ভেসে উঠেছে। এছাড়াও সংক্ষিপ্ত আকারে রাজাকারদের অত্যাচার, মুক্তিযোদ্ধাদের সংগ্রাম, স্বাধীনতার পর বাংলাদেশের চূড়ান্ত বিশৃঙ্খল অবস্থা, নেতৃত্বহীন বাংলাদেশের ছবি লেখক তুলে ধরেছেন। তবে উপন্যাসে অনেকটা জায়গা নিয়েছে লুৎফরের বন্ধু খোকনের সঙ্গে ফিরোজার এক ধরনের ভালোবাসার সম্পর্ক। তার ফলে অন্যান্য প্রসঙ্গগুলো কিছুটা কম গুরুত্ব পায়। তবে লেখক এই ফিরোজার মধ্য দিয়ে যেন মানবতার জয়গান করেছেন। একদা রাজাকারদের দলের সদস্য রশিদকে বাঁচানোর জন্য ফিরোজার মরিয়া চেষ্টা এটাই প্রমাণ করে। অন্যদিকে খোকন চরিত্রের মধ্য দিয়ে জন্মভূমির প্রতি এক অপ্রতিরোধ্য টান (বাঙ্গালদের) আমরা লক্ষ্য করতে পারি।

উড়িষ্যার কোনারক মন্দির ও সমুদ্রসৈকতের প্রেক্ষাপটে লেখা শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের একটি উপন্যাস হলো 'স্বর্গে তিন পাপী' (১৯৭৫)। পরশুরাম, চন্দ্রকান্ত ও অক্ষয়— এই তিন বন্ধুকে নিয়ে উপন্যাসের কাহিনি গড়ে উঠেছে। তিন বন্ধু অনেকদিন পর একদা কলেজের বান্ধবী মীরার কাছে এসেছে। মীরা বিবাহিত। তার স্বামীর কর্মসূত্রে তাকে উড়িষ্যায় থাকতে হয়। এই মীরাকে ঘিরে তাদের মধ্যে এক ধরনের দেহজ আকর্ষণ কলেজের সময় থেকে এখনও বিদ্যমান। বিষয়টি মীরার কাছেও অজনা নয়, তাই হয়তো কিছুটা প্রচ্ছন্ন প্রশ্রয় মীরার মধ্যেও লক্ষ্য করা যায়। এটা প্রায় 'বনবাসী' মীরার কাছে জীবনের রসাস্বাদনের একটি উপায় মাত্র। ফলে এই চারজনকে ঘিরে আকর্ষণের অতীত স্মৃতি ও বর্তমান মুহূর্তের একটি বুনোট তৈরি হয়। মীরার স্বামী নীলাদ্রি তাদের একসময়ের সহপাঠি ছিল (তাদের মত ঘনিষ্ঠ বন্ধু নয়)। উপন্যাসে যাকে অনেক নিষ্ক্রিয় ও প্রায় দর্শকের ভূমিকায় দেখা যায়। পরবর্তীকালে তিনজনের হঠাৎ করে মীরা ও নীলাদ্রির কাছে আসার আসল রহস্য উদ্‌ঘাটিত হয়। তাদের উদ্দেশ্য ছিল এখান থেকে মূর্তি চুরি করে কলকাতায় নিয়ে গিয়ে বিক্রি করা। মূল পরিকল্পনা ছিল চন্দ্রকান্তের (বন্ধুদের মধ্যে লিভার স্বরূপ)। এই কাজ করতে গিয়ে সমুদ্রের জোয়ারের জলে তারা আটকে যায়। প্রায় ভেসে যাবার পথে তিনজনে তিনখানা পাথর ধরে নিজেদেরকে

সামলে নেয়। কিন্তু ডাঙায় ফিরে আসার উপায় নাই। চারিদিকে চাঁদের আলোয় জোয়ারের জল সাদা হয়ে আছে। শুধু শোনা যাচ্ছে জলের প্রবাহিত হবার একটানা আওয়াজ ও ঢেউয়ের শব্দ। মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আমরা তিন বন্ধুকে আত্মমূল্যায়ন করতে দেখি। এরমধ্য দিয়েই উঠে আসে জীবনের প্রতি প্রগাঢ় ভালোবাসা। প্রথমদিকে জীবন সম্পর্কে উদাসীন, বেপরোয়া তিন বন্ধুর সঙ্কটকালীন মুহূর্তে নিজেদের কৃতকর্মের জন্য অনুশোচনা ও বেঁচে থাকার প্রবলতর ইচ্ছাই এই উপন্যাসকে বিশিষ্ট করে তুলেছে।

মধ্যবয়স্ক অনেক চরিত্র শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাসে আমরা দেখতে পাই। 'হিম পড়ে গেল' (১৯৮২) উপন্যাসে এমনই এক চরিত্র হলেন দেবকুমার বসু। মধ্যবয়সে এসে তিনি হঠাৎ মানসিক ভাবে জরাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। ফলে নিজের পরিবার, এলাকা, কর্মস্থল, বন্ধুবান্ধব— সবার কাছ থেকে অনেকটাই দূরে সরে যেতে হয় তাকে। দৈনন্দিন পারিবারিক ও সামাজিক জীবন থেকে এক প্রকার বিচ্যুত হয়ে যান তিনি। অবশ্য এই বিচ্যুতি তাকে কখনোই গভীরভাবে আঘাত করে না। কবিতা রচনার মধ্য দিয়েই নিজের আশ্রয় খুঁজে পান তিনি। আমাদের তথাকথিত ছকে বাঁধা জীবন তার এই বিচ্যুতিকে 'পাগলামো' আখ্যা দেয়। ফলস্বরূপ তাকে বাধ্য করা হয় পরিচিত পারিবারিক ও সামাজিক জীবন থেকে দূরে সরে যেতে। বিচ্ছিন্নতা ও একাকীত্বের বিষয়বস্তু নিয়ে লেখা 'হিম পড়ে গেল' উপন্যাসটি লেখকের বিষয়বৈচিত্র্যের অসাধারণ নিদর্শন।

কিছু কিছু বিষয় শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাসে বারবার ফিরে আসে। প্রথম বিষয়, দখল এবং দ্বিতীয় বিষয়, নিঃসঙ্গতা। এই দুটি বিষয়বস্তুর আবরণ হিসাবে কাজ করে ভালোবাসা পাবার তীব্র আকাঙ্ক্ষা। নগর জীবনের পটভূমিতে লেখা উপন্যাস ও গ্রামীণ জীবনের পটভূমিতে লেখা উপন্যাস, উভয় ক্ষেত্রেই আমরা তা লক্ষ্য করতে পারি। আসলে শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় হয়তো জীবনের ভিন্ন ভিন্ন পরিস্থিতিতে ভিন্ন ভিন্ন সামাজিক-অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটে এই দু'টি বিষয় নিয়ে পরীক্ষা করতে চেয়েছেন। লেখকের উপন্যাস সমগ্রের ধারাবাহিক পাঠ আমাদেরকে এই ধরনের উপলব্ধি নিয়ে আসে। যেমন নগর জীবনের প্রেক্ষাপটে লেখা 'সরমা ও নীলকান্ত' ও 'সতী অসতী' উপন্যাস।

'সরমা ও নীলকান্ত' (১৯৭২) উপন্যাসের প্রধান পুরুষ চরিত্র নীলকান্ত। আর্থিকভাবে স্বচ্ছল, গৃহস্থ, মধ্যবয়সী হলো নীলকান্ত। নিশ্চিত আয় ও ভরা সংসার (পালিত পশু নিয়ে) একটি গতানুগতিক যাপন পদ্ধতি দিয়েছে নীলকান্তকে। বিনিময়ে দখলের মানসিকতা ও উদ্যমী ভালোবাসা ধীরে ধীরে ক্ষয়ে গেছে। ফলে নীলকান্তর হৃদয়ে ঘুণপোকার মত বাসা বাঁধে নিঃসঙ্গতা। অফিসে

কাজ করার সময় একদা কৈশোর-প্রেম সরমার ফোন তার একঘেয়ে হয়ে আসা জীবনের মধ্যে আলোড়ন সৃষ্টি করে। তার মনে হয় 'ব্যাংক অ্যাকাউন্টে'র মত 'ভালোবাসাও ট্রান্সফার' করা যেতে পারে। সরমার সঙ্গে সময় কাটানোর পরেও তার মনে হয়, ''... সাধ মেটে না কিছুতেই। শেষ হয় না। একটা জায়গা দরকার। একখানা ঘর। আগাগোড়া খুলে দেখা দরকার— সরমা কিরকম? সরমা কেমন?''[৭] একটি আপাতভাবে সুখী ভর-ভরান্ত সংসার থাকার পরেও সরমাকে একেবারে নিবিড় করে একান্ত নিজের করে পাবার তীব্র আকাঙ্ক্ষা অনিশ্চিত, অস্থির জীবন কাটানো সরমাকেও চমকে দেয়। কারণ সরমার মনে হয়, তাকে নিবিড় করে পাবার নীলকান্তর ইচ্ছা আসলে পুরোপুরি দখল বা অধিকার পাবার জেদ। এই জেদ কোনও মানুষের মধ্যে নিশ্চিত, নিরাপদ, সুখী সংসারে দীর্ঘদিন কাটানোর ফলশ্রুতি থেকে উদ্ভূত হতে পারে। আবার সেই সঙ্গে স্বাদ বদলানোর ইচ্ছা সেই জেদকে পুষ্টি জোগায়।

আসলে নীলকান্তর মত মানুষদের রোজকার ঘর সংসারের কাজে ডুবে থাকার ফলে প্রেমে শ্যাওলা ধরে। ফলে ধীরে ধীরে এই যাপন-পদ্ধতি থেকে ভেসে ওঠে নিঃসঙ্গতা যা রোজকার ঘর-সংসারের কাজ মুছে দিতে পারে না। যাদের মোটামুটি নিরাপদ নিশ্চিন্ত আয় রয়েছে তাদের ক্ষেত্রেই সাধারণত নিঃসঙ্গতা বড় হয়ে ওঠে। কারণ এই সব মানুষেরা মধ্যবয়সে এসে 'মিডল এজ প্রবলেম'-এ ভোগেন। এদের কাছে খুব বেশি আনন্দ বলতে সম্ভোগের মুহূর্তের সমষ্টি। তারপর কেজো কথার পরিবর্তে আর তেমন কিছু করার বা বলার কথা স্ত্রীর সঙ্গে থাকে না। এজন্য নীলকান্ত পরিষ্কার দেখতে পায়, ''আমরা পৃথিবীতে আছি ভালোবাসাবাসির জন্যেই। আমাদের আত্মা বা সোল কোন রঙের তা জানি না। ... অথচ সবসময় আমরা একজন আরেকজনের ওই জিনিসটা ছুঁতে চাইছি, হাত দিয়ে ধরে দেখতে চাই। হয় না বলেই যতটা কাছে যাওয়া যায়— এই ভেবে আমরা বুকে বুক লাগাই, পারলে পিষে ফেলে আত্মার খোসা একেবারে ভেঙে ফেলতে চাই।''[৮] এজন্যই হয়তো সবকিছু থাকার পরেও নীলকান্তর মধ্যে সরমাকে পাবার তীব্র আকাঙ্ক্ষা জন্মায়।

সরমার কাছে একটি স্থির, নিশ্চিত, নিরাপদ জীবনের হাতছানি থাকলেও শেষপর্যন্ত সে পুরানো অভ্যস্ত জীবনকেই বেছে নেয়। কারণ দীর্ঘদিনের অভ্যস্ত জীবন থেকে বের হবার জন্য যে সাহস দরকার হয়, তা সরমার মধ্যে ছিল না। আকাঙ্ক্ষা ছিল কিন্তু তাকে বাস্তবায়িত করার জন্য যতগুলো মানসিক বাধা পেরোতে হত, তা সরমা করতে পারেনি। ফলে মধ্যবয়সে এসে নীলকান্তর দীর্ঘকালের পারিবারিক জীবন থেকে বিচ্যুতি তার একঘেয়ে জীবনের একটি পরিণাম হিসাবে আসে।

প্রায় একই রকম বিষয় নিয়ে লেখা উপন্যাস হলো 'সতী অসতী' (১৯৭৫)। উপন্যাসের প্রথম অংশটির নাম 'সতী' এবং দ্বিতীয় বা শেষ অংশটির নাম 'অসতী'। উপন্যাসটিকে ঘিরে রয়েছে প্রেম, অপ্রেম, দখলের অধিকার, দেহ নির্ভর ভালোবাসা, মধ্যবিত্ত নিরাপত্তাবোধ ইত্যাদি। উপন্যাসের দু'টি অংশে দুটি কাহিনি বলেছেন লেখক। দু'টি কাহিনিতেই সমাজে প্রচলিত সতীত্বের ধারণা প্রশ্নচিহ্নের সামনে দাঁড় করিয়েছেন। শুধু তাই নয়, নারী-পুরুষের ভালোবাসায় বিশেষ করে নারীর প্রতি পুরুষের ভালোবাসায় পুরুষের মধ্যে নারীর সবটা দখলের মনোভাব সুপ্ত থাকে। 'সতী' অংশে দেখা যায়, হেমন্ত একসময় রোগাটে গরীব রাজেশ্বরীকে প্রত্যাখ্যান করে বিয়ে করেছিল বাসবীকে। তার দেহজ ভালোবাসা হেমন্তের কাছেই বুমেরাং হয়ে ফিরে আসে। বাসবী নিজের চেয়ে কম বয়সের একটি ছেলের (অবিনাশ) সঙ্গে পরকীয়ায় লিপ্ত হয়। হাতেনাতে ধরার পর হেমন্ত তাকে ঐ ছেলেটির কাছেই পাঠিয়ে দেয়। দাদা-বৌদির সংসারে সন্তানকে সঙ্গে নিয়েই গতানুগতিক জীবন কাটাতে থাকে হেমন্ত। একদিন ঝোঁকের মাথায় বেশ্যাপল্লীতে গিয়ে পুলিশের হাতে ধরা পড়ে। আদালতে জামিন নিয়ে ফেরার পথে হঠাৎ দেখা হয় একদা প্রেমিকা রাজেশ্বরীর সঙ্গে। যাকে জীবন যুদ্ধের কঠিন পথে বেঁচে থাকার জন্য বেছে নিতে হয়েছে পুরুষের দৈহিক ক্ষুধা মেটানোর কাজ। হেমন্ত পুনরায় ফিরে যেতে চায় সেই পুরানো দিনগুলোতে । হেমন্ত নিজের দোষ স্বীকার করে রাজেশ্বরীকে বিয়ে করে তার বর্তমান জীবন থেকে মুক্তি দিতে চায়। কিন্তু অনেক পুরুষের ঘনিষ্ঠ সঙ্গ পাওয়া রাজেশ্বরী উপলব্ধি করে আর পাঁচটা পুরুষের সঙ্গে হেমন্তের ভালোবাসার কোনও পার্থক্য নেই। হেমন্তর ভালোবাসা এখনও দেহকে ছাড়িয়ে উঠতে পারেনি। এখনও হেমন্তর মধ্যে দখলের মানসিকতা রয়েছে। তাই রাজেশ্বরী বলে, ''এই এক দোষ তোমাদের। পুরোপুরি দখল না করতে পারলে সুখ পাওনা।''[৯] হেমন্ত নিজেও উপলব্ধি করে, সে রাজেশ্বরীকে পুরোপুরি দখল করতে চায়। আর তা পারে না বলেই অতৃপ্তি হেমন্তকে তাড়া করে বেরায়। শেষপর্যন্ত হেমন্তর দখলে কোনও নারীই থাকে না, এমনকি ছেলেরও দখল ছেড়ে দিতে হয় বাসবীর কাছে। এই কাহিনির শেষে দেখা যাচ্ছে হেমন্ত আবার উপস্থিত হচ্ছে বেশ্যাপল্লীতে যেখানে অর্থের বিনিময়ে কিছুক্ষণের জন্য কোনও নারীর পুরোপুরি দখল নেওয়া যায়।

'অসতী' অংশের কাহিনিতেও আমরা এই দখলের গল্প শুনি। 'সতী' অংশে বাসবী বা রাজেশ্বরী কেউই শেষপর্যন্ত ফিরে আসেনি হেমন্তর কাছে। কারণ তারা জানত পুনরায় হেমন্তর সঙ্গে ভালোবাসার সম্পর্ক গড়ে ওঠা সম্ভব নয়। বাসবী দ্বিতীয়বার ঠকাতে চায়নি কিংবা রাজেশ্বরী

অনুভব করেছিল নতুন করে হেমন্তকে ভালোবাসা সম্ভব নয়; তাই দু'জনের কাছেই সামাজিক সম্মানযুক্ত পথ বেছে নেবার সুযোগ থাকলেও তা নেয়নি। লেখকের চোখে এরাই 'সতী', সমাজ অন্য কথা বললেও। অন্যদিকে 'অসতী' অংশে নন্দা বাসবী বা রাজেশ্বরীর বিপরীত মেরুর চরিত্র। সমাজের চোখে নন্দার মত নারীরা সতী হলেও, এরাই প্রকৃত অর্থে অসতী। এছাড়া এই নন্দাকে ঘিরেও রয়েছে স্বামী পৃথ্বীশ ও রীতেশের মধ্যে সুপ্ত প্রতিযোগিতা যার ইন্ধন দাতা স্বয়ং নন্দা। এখানেও পুরুষের প্রেমে দেখা যায় দখলের মানসিকতা।

বিষয়বৈচিত্র্যের দিক থেকে শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের অন্যতম একটি উপন্যাস হলো 'অদ্য শেষ রজনী' (১৯৭৭)। গ্রামের কবিয়াল বা অপেরা পার্টি নিয়ে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের দুটি উপন্যাস রয়েছে বা বিশেষ কোনও লোকগানের গোষ্ঠী নিয়ে সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজও একটি উপন্যাস লিখেছেন কিংবা মদন বন্দ্যোপাধ্যায়ের অ্যান্টনি ফিরিঙ্গির জীবন নিয়ে লেখা 'কবিয়াল অ্যান্টনি ফিরিঙ্গি' বাংলা সাহিত্যের অন্যতম সম্পদ। অন্যদিকে নগর কলকাতার আধুনিক জীবনের অন্যতম একটি সাংস্কৃতিক অঙ্গ হলো গ্রুপ থিয়েটার। এই গ্রুপ থিয়েটারের বিভিন্ন কুশীলব, তাদের ব্যক্তিজীবনের স্বপ্ন-সাধ-আকাঙ্ক্ষা, অভিনয় জীবনের উত্থান-পতন বা নতুন মোড় নেওয়া, সেই সঙ্গে গ্রুপের সদস্যদের সংযোজন-বিয়োজন, অন্য গ্রুপের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা, ঈর্ষাকাতরতা, ছল-চাতুরী, সর্বোপরি একটি গ্রুপের টিকে থাকার লড়াই— এমন বিচিত্র জগৎ বাংলা উপন্যাস সাহিত্যের ইতিহাসে কখনও উঠে আসেনি। শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ই প্রথম লেখক যিনি এই অনালোচিত বিষয়কে উপন্যাসে জায়গা দিলেন। শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় নিজস্ব বয়ানে বলেছেন, ''দেখাতে চেয়েছি— উঠতি চাকায় চড়ে গ্রুপ থিয়েটার যখন সাফল্যে পৌঁছায়— তখনি চাকা পড়তির মুখে। সেটাই শেষ রজনীর দিকে যাত্রা শুরু। মঞ্চের নাটকের চেয়েও নাটকের মানুষগুলো নিয়ে গ্রিনরুমে আরও বড় নাটক হয়ে যায়। সে নাটকের নায়ক স্বয়ং নিয়তি।''[১০]

এই উপন্যাসের প্রধান পুরুষ চরিত্র অমিয় বন্দ্যোপাধ্যায়। তারই উদ্যোগে তৈরি হয়েছে 'পঞ্চমুখ' নামক গ্রুপ থিয়েটার। ছোটবেলা থেকেই অভিনয়ের দিকে তার প্রবল টান। এর পিছনে ছিল দিদার (দিদিভাই) প্রশ্রয় ও প্রেরণা। বড় হবার পর অভিনয়ের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে নাটক রচনা ও নির্দেশনার কাজ। শুধু তাই নয়, প্রতিযোগিতা ও মন্দার বাজারে একটি গ্রুপ থিয়েটারের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার কাজ। এরজন্য অমিয়কে অনেক আত্মত্যাগ করতে হয়েছে। মোটামুটি ভালো বেতনের চাকরি ছেড়ে দিয়ে সম্পূর্ণরূপে গ্রুপ থিয়েটারে মনোনিবেশ করেছে। তার স্ত্রী লীলাও স্বামীর

স্বপ্ন-সাধ-আকাঙ্ক্ষাকে বাস্তবায়িত করার জন্যে সব রকমের কষ্ট স্বীকার করেছে অত্যন্ত হাসিমুখে বিন্দুমাত্র অভিযোগ ছাড়া। নাটক নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার অন্যতম জায়গা হলো গ্রুপ থিয়েটার। অমিয়ও সেই পরীক্ষা-নিরীক্ষার ক্ষেত্রে কখনও পিছপা হয়নি। সাংসারিক জীবনের সব রকম দায়িত্ব ও টেনশন লীলার কাঁধে অর্পণ করে অমিয় বন্দ্যোপাধ্যায় এগিয়ে গিয়েছে। কিন্তু এই উপন্যাসের কাহিনি মঞ্চে প্রদর্শিত নাটক নিয়ে নয়; মঞ্চের পিছনের মানুষগুলোর কর্মকাণ্ড নিয়ে যে প্রকৃত নাটক গড়ে ওঠে, সেটা নিয়ে।

উপন্যাসে আমরা দেখতে পাই প্রথম দিকে 'পঞ্চমুখ'-এর দর্শক টানার ব্যর্থতা। এরফলে ঋণের জালে জড়িয়ে যেতে থাকে অমিয়। তার স্ত্রীর সব গয়না ও সঞ্চিত অর্থও শেষ হয়ে যায়। তারপরেও নাটক মঞ্চস্থ করে যেতেই হবে। এটা শুধু এক শিল্পীর স্বপ্ন-সাধ-আকাঙ্ক্ষা নয়, এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে 'পঞ্চমুখ' গ্রুপ থিয়েটারের সকল অভিনেতা ও কর্মীর ভবিষ্যৎ জীবন-জীবিকা। এই কঠিন পরিস্থিতিতেও অমিয় প্রায় একার হাতে চালিয়ে নিয়ে যায় নাটক ও 'পঞ্চমুখ' গ্রুপ থিয়েটারকে। এই ভয়ঙ্কর দুঃসময়ে অমিয়র সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটে তৎকালীন সময়ে প্রখ্যাত প্রতিষ্ঠিত অভিনেত্রী রজনীর। বিপর্যস্ত সময়েও নতুন নাটক লেখা ছাড়েনি অমিয়। তার দুঃসাহসিক পরীক্ষায় সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয় রজনী। মঞ্চে ও মঞ্চের বাইরে নতুন যুগলবন্দী হয়ে ওঠে অমিয় ও রজনী। তাই প্রথম কোনও নাটক হাউসফুল হবার পরেও অবলীলাক্রমে নতুন পরীক্ষায় ঝাঁপিয়ে পড়ে অমিয়। 'সুজাতা' নাটকের মঞ্চায়ন বিরাট সাফল্যের মুখ দেখে। রজনীর ব্যক্তিগত জীবনের শোচনীয় ঘটনাও পাঠকের সামনে তুলে ধরেন লেখক। অভিনয় জীবনের জন্য রজনীর দাম্পত্য জীবনের ব্যর্থতা, শশাঙ্কর (রজনীর স্বামী) রজনীর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা, অবহেলা, উদাসীনতা, রজনীর প্রতি তৃপ্তির (পুরানো গ্রুপের সিনিয়র অভিনেতা) প্রবল টান ইত্যাদি এক জটিল নাটক সৃষ্টি করে। অন্যদিকে অমিয়র সঙ্গে রজনীর ঘনিষ্ঠতা, লীলার সন্দেহ এবং ধীরে ধীরে লীলার দূরে সরে যাওয়া আর একটি নাটকের জন্ম দেয়।

সাফল্য মানুষকে অনেক সময় এক ধরনের নিশ্চয়তা, স্থিতাবস্থা প্রদান করে। গ্রুপ থিয়েটারের ক্ষেত্রেও সেটা ব্যতিক্রম নয়। 'সুজাতা' নাটকের বিরাট সাফল্য 'পঞ্চমুখ'কে আর্থিকভাবে সচ্ছল, প্রতিষ্ঠিত করলেও গ্রুপকে অলস করে তোলে। সফলতার শীর্ষে রোপিত হয় মৃত্যুর বীজ। সফলতার অতিবিস্তার পুরানো মাটিকে এমন ভাবে আঁকড়ে ধরে যে চলমানতার শক্তিই হারিয়ে ফেলে। আর্থিক স্বচ্ছলতা মানসিক স্বস্তি ও ভাবনায় জড়তার সৃষ্টি করে। ফলে এখানে শুরু হয় আর একটি

নতুন নাটক। যে রজনীর হাত ধরে এই সাফল্য, তার স্থায়ী স্বরভঙ্গ হওয়া, স্ত্রী লীলার সন্তানসহ দূরে সরে যাওয়া, শংকরের গ্রুপের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা ও ছেড়ে চলে যাওয়া ইত্যাদি প্রতিকূলতার মধ্যেও অমিয় বুঝতে পারে এগিয়ে চলা ছাড়া তার আর কোনও উপায় নেই। কাজ ও ভাবনার স্থবিরতা ভাঙতে একটু দেরি হলেও অমিয় পুনরায় নতুন পরীক্ষার পথে যাত্রা শুরু করে। থিয়েটারের সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন মানুষের সংগ্রামের কথা যেভাবে এই উপন্যাসে উঠে এসেছে, তাতে 'অদ্য শেষ রজনী' বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে অমূল্য রত্নে পরিণত হয়েছে।

দক্ষিণ ২৪ পরগনার অন্তর্গত চম্পাহাটিকে পটভূমিকে করে শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের আরেকটি অন্যতম উপন্যাস হলো 'ঈশ্বরীতলার রূপোকথা' (১৯৭৬)। আমরা আগেই বলেছি যে, একটি উপন্যাসই যেন লেখক সারাজীবন ধরে লিখে গেছেন। একটি চরিত্রকেই যেন ভিন্ন ভিন্ন ভাবে সাজিয়ে বিভিন্ন পরিস্থিতিতে ফেলে লেখক পরীক্ষা করেছেন। 'কুবেরের বিষয় আশয়' উপন্যাসের কুবের চরিত্রই যেন এই উপন্যাসে হয়েছেন অনাথবন্ধু বসু। এবার তিনি মফস্বল ঈশ্বরীতলায় এসে বাড়ি করেছেন। স্ত্রী (শান্তা), দুই কন্যা (টুকু ও লিলি) আর একপাল বিভিন্ন রকমের পশু (যাদেরকে তিনি সন্তানতুল্য দেখেন) নিয়ে অনাথ বসুর গোছানো সংসার। আর্থিক সচ্ছলতার জন্য মফস্বলের মানুষ তাকে বিশেষ সমীহের চোখেই দেখে। নগরজীবনের কোলাহল ও জটিলতা থেকে মুক্ত হয়ে বেশ ভালোভাবেই দিন কাটছিল অনাথ বসুর। কিন্তু আর পাঁচটা সাধারণ মানুষের দৃষ্টিতে এই জীবন ও জগৎ যেভাবে ধরা দেয়, তার কাছে সর্বদা সেই ভাবে ধরা দেয় না। যেমন, ''এ সময় ঈশ্বরীতলার ওপর দিয়ে সম্ভবত নিরক্ষরীয় বায়ু বয়ে যায়। ওই বায়ু বোধ হয় কোনো লেখাপড়া শেখেনি। কেননা খালপাড়ের গাছগুলোর ডালপালা পাতাসুদ্ধ এই বাতাসে ওলট্‌পালট্‌ খাচ্ছে। ... আজ পূর্ণিমা হতে পারে। চন্দনেশ্বর মৌজা পেরিয়ে দূরের ধোঁয়াটে জায়গার ওপরকার আকাশে এরই ভেতর চাঁদের একটা আউটলাইন ফুটে উঠল। ভালো জ্যোৎস্না পেলে ঈশ্বরীতলার এদিকটা একদম বুনোপরী হয়ে যায়।"[১১] এই রকম অসংখ্য উদাহরণ এই উপন্যাসে সমগ্র কাহিনি জুড়ে আছে। ঈশ্বরীতলায় বাস করার ফলেই জীবন ও জগৎকে দেখার একটি অন্য রকম দৃষ্টি পেয়েছেন অনাথ বসু। কারণ 'জীবন এখানে প্রত্যক্ষ'। জীবন ও জগতের সঙ্গে এই প্রত্যক্ষ মেলামেশার পর্বের মাঝখানে তার পরিচয় হয় এক বাজিকরের সঙ্গে। এরপরেই অনাথ বসু জীবনের যাত্রাপথে আরেকটি নতুন পথের সন্ধান পান। প্রকৃতিকে শুধু নিবিড়ভাবে উপলব্ধি, উপভোগ করা নয়, সেই প্রকৃতির মাঝে নিজের উদ্যোগে কিছু জিনিস তৈরি করার আনন্দ। এরপরেই অনাথ বসুর নেতৃত্বে শুরু হয়ে যায় এক বিশাল কর্মযজ্ঞ।

প্রাথমিক পরিকল্পনা ছিল বিঘা চারেক জমিতে কৃষিকাজ করবে। কিন্তু তাতে তার মন ভরছিল না। সে লক্ষ্য করল ঈশ্বরীতলা ও তৎসংলগ্ন অঞ্চলে শীতকালে ধান উঠে গেলে প্রায় সবার জমি পতিত পড়ে থাকে। সব কৃষককে একজোট করে ধান চাষ করার পরিকল্পনা করেন তিনি। শুরু হয়ে যায় গ্রামে গ্রামে গিয়ে প্রচার। যেখানে অবিশ্বাস প্রবল সেখানে অনাথ বসুর কথায় মানুষ বিশ্বাস করে। অনাথ বসু বলে, '' আমরা ব্যাংক থেকে ধার করে যন্ত্রপাতি, পাম্প, সার, বিষ, বীজ কিনব। যাদের জায়গা এখন পড়ে থাকে— তারা চাষ করতে দিলে এক বস্তা ধান পাবে। ফসল উঠলে জমিদারের ভাগ বাদ দিয়ে অর্ধেক চাষীর। অর্ধেক ব্যাংকের। ...আমার কাজ হল— এদের সবাইকে একত্র করা।''[১২] অনাথ নিজে জামিন হয়ে ব্যাংক থেকে ঋণ করলো। সকলে মিলে ধান চাষ উৎসবের চেহারা নিল ঈশ্বরীতলা ও তৎসংলগ্ন অঞ্চলে। আর সেই উৎসবের রস প্রতিমুহূর্তে শুষে নিতে থাকল অনাথবন্ধু বসু। কিন্তু প্রকৃতি তার নিজের খেয়ালে চলে। এই বিশাল কর্মকাণ্ডে একের পর এক প্রাকৃতিক বাণ আছড়ে পড়তে থাকে। প্রথমে মাজরা পোকা, তারপর পাম্প থেকে জল না ওঠা। ব্যাংক থেকে আরও ঋণ করে মাটির নিচে বসানো হয় পাইপ। কিন্তু জলধারা এত ক্ষীণ যে তাতে বিশেষ লাভ হয় না। শেষপর্যন্ত যে ধান হল বেশিরভাগ তা পোকায় কাটা। বিঘার পর বিঘা জমি কঙ্কালের চেহারা নিয়ে পড়ে থাকে অনাথবাবুর চোখের সামনে। বিপর্যয় তখনও শেষ হয়নি। তুমুল বৃষ্টিতে বিদ্যাধরীর বাঁধ ভেঙে গিয়ে অনাথের হাঁস, মুরগি ভাসিয়ে নিয়ে যায়। বেড়াল, কুকুর, হাঁস, মুরগি, ছাগল অনাথের যা কিছু প্রিয়; সবাই তার সঙ্গ ছেড়ে দিল। শেষপর্যন্ত অর্থকষ্টে তার অত্যন্ত প্রিয় গরু (উমা)-কেও তিনি বেঁচে দিলেন। দেনার দায়ে ঈশ্বরীতলায় তৈরি করা বাড়িও বিক্রি করে দিতে হলো। মেয়ে, বউ নিয়ে ঠাঁই নিল কলকাতার ভাড়া বাড়িতে।

অনাথবন্ধু বসুর জীবনের পরিবর্তন দেখানোর সঙ্গে সঙ্গে তিনি ঈশ্বরীতলার পরিবর্তনও এই উপন্যাসে দেখিয়েছেন। ডাকাত সন্তোষ টাকি, প্রভাবশালী দক্ষিণা চক্কোত্তি, তেলেভাজা বংশী কাপালি, জগেন যাত্রা প্রমুখ চরিত্রের পরিবর্তন ঈশ্বরীতলায় পরিবর্তীত সময়কেই ইঙ্গিত করে। এদের সকলকে নিয়ে লেখক ঈশ্বরীতলার রূপোকথা নির্মাণ করেন।

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'আবিষ্কার' (১৯৭৭) উপন্যাসটি নাগরিক জীবনের প্রেক্ষাপটে লেখা। আমরা জানি শ্যামলের লেখায় বিভিন্ন বিষয়-প্রসঙ্গ ঘুরে ফিরে আসে। এই উপন্যাসেরও বীজ আমরা খুঁজে পাই শ্যামলেরই লেখা 'অর্জুনের অজ্ঞাতবাস' উপন্যাসে। সেই উপন্যাসের প্রধান পুরুষ চরিত্র প্রমথ শেষপর্যন্ত যাকে বিয়ে করে, সেই বীথির ছোড়দি ভক্তিকে কেন্দ্র করে এই (আবিষ্কার) উপন্যাসের

কাহিনি নির্মিত হয়েছে। আমরা আগেই জেনেছি নারীপাচার চক্রের সঙ্গে জড়িত নির্মল চক্রবর্তী কাঠের ব্যবসায়ীর পরিচয় দিয়ে ভক্তি লাহিড়ীকে বিয়ে করে। বিয়ের পর ভাড়া বাড়িতে তিন মাস একসঙ্গে কাটায় তারা। তারপরেই এরোপ্লেনের টিকিট কাটতে গিয়ে আর ফিরে আসেনি। আমাদের আলোচ্য উপন্যাসে সেই নির্মল চক্রবর্তী ফিরে আসে। নিতাই নাম নিয়ে বর্তমানে সে হোমিওপ্যাথের ডাক্তার। উভয়ই উভয়কে আবিষ্কার করে। যে বিশ্বাসকে সম্বল করে ভক্তি সবার অনুরোধ উপেক্ষা করে দ্বিতীয়বার বিয়ে করেনি, সেই বিশ্বাস (নির্মল চক্রবর্তী আবার ফিরে আসবে) শেষপর্যন্ত জয়ী হয়। এই বিশ্বাসের সঙ্গে জড়িয়ে ছিল ভালোবাসার অনুভূতিও। কিন্তু দীর্ঘ পনেরো বছরের ব্যবধানে ভক্তি দ্বিতীয়বার বিয়ে না করলেও তার যাপিত জীবনে পরিবর্তন এসেছিল স্বাভাবিক নিয়মেই। ফলে আধপাগলা ব্রজেন্দ্রের প্রতি ভক্তির মনে জন্ম নেয় ভালোবাসা। পরিণতিস্বরূপ অতীত ভালোবাসার চাহিদার তুলনায় বর্তমান ভালবাসার দাবি দ্বিধাগ্রস্ত ভক্তির মনে প্রবল হয়ে ওঠে। তাই যে পুনর্মিলন হবার ছিল, তা হয় না।

''রেখার ডাক নাম মেনি। তার সঙ্গে প্রেম হয়েছিল। ... তাকে একবার পরী হতে দেখেছিলাম। ... তখন আমি আর পরী একসঙ্গে ব্যবসা করি। ...

দ্বিতীয়ার নাম মনে নেই। সেও তো একজন নারী। আসলে মধ্যরাতের।... আর আমরা তিনজন- তিনখানা চেয়ারে। বাইরে অনর্গল কলকাতা ভেসে গেছে। আমরা দারাদরি করে ওকে কোথায় নামিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলাম তার কোনো ঠিক ছিল না।''[১৩] দু'টি নাতিদীর্ঘ কাহিনি নিয়ে 'পরীর সঙ্গে প্রেম' উপন্যাসটি তৈরি হয়েছে। কোনো কোনো মেয়েদের নিজেকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য কীভাবে পরী সাজতে হয় তা দেখানো হয়েছে এই উপন্যাসে। শুধু নিজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখাই নয়, এই সুযোগসন্ধানী পৃথিবীর সুযোগসন্ধানী মানুষের ধূর্ততা ও লালসার জন্যেও তাদেরকে পরী সাজতে হয়। এই সব বিষয়কেই উন্মোচিত করেছে 'পরীর সঙ্গে প্রেম' (১৯৭৭) উপন্যাসটি।

পুরুষের ভালোবাসা। আর সেই ভালোবাসার মধ্যে নিহিত দখল বা অধিকারের স্বরূপ উন্মোচন শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের একটি অন্যতম প্রিয় বিষয়। বিশেষ করে নারীর দৃষ্টিকোণ ব্যবহার করে পুরুষের ভালোবাসার স্বরূপ উন্মোচন করেছেন লেখক। আর আমরা তো জানি, 'দখল' সেটা জমিকে নিয়েই হোক বা নারী শরীরকে কেন্দ্র করেই হোক— মানব সভ্যতার একটি আদিমতম বিষয়। শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের বিভিন্ন উপন্যাসে আমরা তা বারবার দেখতে পাই। আমাদের আলোচ্য 'পরবর্তী আকর্ষণ' (১৯৭৮) উপন্যাসটিতে এই বিষয়টি উঠে এসেছে। রবিরঞ্জন গুহ মধ্যবয়সে পৌঁছে হঠাৎ

তার একদা প্রেমিকা তপতীকে খুঁজে পায়। রবিরঞ্জন ও তপতী দুজনেই বর্তমানে সংসারী জীবন পালন করছে। অবশ্য তপতী বিবাহ পরবর্তী সময়ে গুরুদেবের শরণাপন্ন হয়ে পুরো পরিবারসহ সংসারে থেকেই আধ্যাত্মিক জীবন (মেয়ে এষা সহ) বেছে নিয়েছে। অন্যদিকে এতদিন পর তপতীর সন্ধান রবিরঞ্জনের মধ্যে ব্যর্থ প্রেমের বেদনা জাগিয়ে তোলে। সেই সঙ্গে জেগে ওঠে শোধবোধ বা প্রতিশোধের এক ধরনের স্পৃহা। এই মনোভাব জেগে ওঠার পেছনে কাজ করেছে হয়তো একদা তপতীকে সম্পূর্ণরূপে দখল করতে না পারার ব্যর্থতা থেকে। আবার তপতী চায় রবির মন থেকে সমস্ত ক্ষোভ, না পাওয়ার ব্যর্থতাবোধ থেকে মুক্ত করে, তাকেও ধর্মের জীবনে নিয়োজিত করতে। ফলে শুরু হয় আধ্যাত্মিক বিশ্বাসের সঙ্গে রক্তমাংসের আদিমতম চাহিদার লড়াই। শেষপর্যন্ত এই লড়াইয়ে জয়ী হয় রক্তমাংসের আদিমতম চাহিদার। এই কাহিনির পাশাপাশি সমান্তরালভাবে অগ্রসর হয়েছে তপতীর বাবা বিনয় বসুর কাহিনি। এই কাহিনির মধ্যেও আমরা দেখতে পাই ভয়ঙ্কর এক দখলদারি মানসিকতা। যে মানসিকতার কবলে পড়ে এক নারীকে তার স্বামী, সন্তান ছেড়ে অন্য এক পুরুষের রক্ষিতা হয়ে কাটাতে হয় একই শহরে। এই নারী তপতীর ছোট মাসি এবং সেই অন্য পুরুষ তপতীরই বাবা বিনয় বসু। ধর্মীয় জীবনের ভন্ডামিও বিনয় বসুর মধ্যে দিয়ে উন্মোচিত করেছেন লেখক। ভগবান সম্পর্কে লেখক বলেছেন, ''ভগবানের কোন অ্যাড্রেস নেই। কিছু বই, মন্দির, তীর্থস্থান, ভক্ত, গুরুদেব, অবতার, ভজন আর লীলাখেলার কাহিনিই ভগবানের স্মৃতি মানুষের মনে জীইয়ে রাখে। এর সঙ্গে থাকে কিছু অনুষ্ঠান। সমুদ্রস্নান। গঙ্গা পুজো। হিমালয় বন্দনা। এবং সংবৎসরে ক্যালেন্ডারে ক্যালেন্ডারে ছবি ছেপে ছোট বড় মাঝারি ব্যবসায়ীরা ভগবানের স্মৃতি গেরস্থের হৃদয়ে জাগরুক রাখে।''[১৪] আমরা কীভাবে বাহ্যিক আচার-অনুষ্ঠানসর্বস্ব ধর্মের মধ্যে নিমজ্জিত হচ্ছি কিন্তু দখলের আদিমতম চাহিদাকেও অস্বীকার করতে পারছি না— এই বিষয়ই উঠে এসেছে 'পরবর্তী আকর্ষণ' উপন্যাসটিতে।

মফস্বলের জীবন-অভিজ্ঞতার আর একটি অন্যতম ফসল হলো 'স্বর্গের আগের স্টেশন' (১৯৮০)। প্রায় একই গ্রাম লেখকের প্রায় সব মফস্বল কেন্দ্রিক উপন্যাসে ঘুরে ফিরে এসেছে। এই উপন্যাসের গ্রামের নাম 'দক্ষিণ মালঞ্চ'। ঠিক যেভাবে কুবের চরিত্র রূপান্তরিত হয়েছে অনাথবন্ধু চরিত্রে; এখানে আবার রূপান্তরিত হয়ে মিশে গেছে কখনও খগেনে— কখনও বিজনে। এই উপন্যাসের প্রধান চরিত্র খগেন নস্কর। পায়ের পাতা বাঁকা বলে কৃষিপ্রধান অঞ্চলে সে কোনও কাজ পায় না। স্ত্রী বেস্পতি ও দুই ছেলে হাজরা ও বজরা সকলেই পৃথক খায়। আর ছোট ছেলে ঘটির বয়স কম বলে সে

কখনও বাপের সঙ্গে থাকে কখনও বা মা বেস্পতির সঙ্গে থাকে। বড় ছেলে হাজরা মজুরি করে, ব্যাঙ বেচে আর সুযোগ পেলে চোর হয়েও কাজ করে। অন্যদিকে ওয়াগন-ব্রেকার বজরা । আর বেস্পতি তার আহার্য জোগাড় করে মানুষের বাড়িতে বাড়িতে দুধ বিক্রি করে। খগেন ক্ষেতমজুরি করতে না পেলেও গ্রামের মধ্যে 'সৎ মানুষ' হিসেবে তার একটা পরিচিতি আছে। তাই ভদ্দরলোকের বাড়িতে বিভিন্ন কাজে পাহারা দেবার জন্য তার ডাক পড়ে। চাহিদা কম থাকায় গাছের ফল, রস, কখনও মাছ ধরে খগেন নস্করের দিন চলে যায়। তবে এই খগেনের অন্য ধরনের গুন আছে। বিভিন্ন গাছের শেকড়বাকড়ের বৈশিষ্ট্য তার নখদর্পণে, সাপেদের জগতে তার অবাধ বিচরণ। সাধারণ মানুষ থেকে এক ব্যতিক্রমী দৃষ্টি পেয়েছে প্রকৃতিকে অনুভব করার জন্য, দেখার জন্য। প্রকৃতিকে দেখার এই দৃষ্টি দৈনন্দিন কেজো জগতে যারা ডুবে থাকে, তারা কোনও দিন অর্জন করতে পারে না। খগেন প্রকৃতির সাধারণ বাতাসের ভেতর আরেক রকম বাতাস, সাধারণ আলোর ভেতর অন্য রকম আলো দেখতে পায়।

অন্যদিকে বিপিন বসু বাইরে থেকে এসে জমিজমা কিনে বাড়ি করেছে 'দক্ষিণ মালঞ্চ'তে। সে একদিকে যেমন কলকাতায় গিয়ে চাকরি করে তেমনি সৌখিন চাষি হিসাবে কৃষিকাজে মগ্ন থাকে। মানুষদের বিশেষ করে মধ্যবিত্ত আয়ের মানুষদের রাতারাতি বড়লোক হবার স্বপ্ন থাকে। তারই ফলশ্রুতিতে খগেনকে দেখে বিপিনের মাথা থেকে বের হয় সাপের বিষ, সাপের চামড়া, গোসাপ চালান দেওয়ার বুদ্ধি। যে ব্যক্তি সাপ ও মানুষকে এক করে দেখে, সেই খগেনের কাছে এই কাজ বিবেকে বাঁধে। কিন্তু শেষপর্যন্ত বিপিনের বুদ্ধিতে সায় দেয় খগেন। মানুষদের থেকে সাপেদের সঙ্গেই খগেনের ভাব বেশি। কারণ সে মনে করে মানুষ সাপেরই মতো বরং সাপেদের চেয়ে মানুষের বিষ আরও ভয়ঙ্কর, আরও ক্ষতিকর। এক সময় তন্ত্রসাধনার সঙ্গেও জড়িয়ে গিয়েছিল খগেন। খগেনের স্বপ্ন, তার মনের অবচেতন অংশের চিন্তা-ভাবনা, সাপেদের সঙ্গে তার মেলামেশা— এই সবকিছু নিয়েই নির্মিত হয়েছে উপন্যাসটি।

'চন্দনেশ্বর জংশন' (১৯৮০) উপন্যাসটি 'স্বর্গের আগের স্টেশন' উপন্যাসের সম্প্রসারিত অংশ বলা যেতে পারে। আগের উপন্যাসের অনেক ঘটনা, চরিত্র, স্থান-নাম আমরা আলোচ্য উপন্যাসেও দেখতে পাই। এখানে খগেন নস্করের মেজো ছেলে ওয়াগান-ব্রেকার বজরা প্রধান চরিত্র। তবে এখানে বজরার বড় দাদার নাম হাজরা নয়, হৃদয় (হৃদয় নস্কর)। চন্দনেশ্বর মৌজার নাম আমরা 'ঈশ্বরীতলার রূপোকথা' উপন্যাসেও পাই। আসলে দক্ষিণ ২৪পরগনার চম্পাহাটিতে যে সময় কাটিয়েছেন লেখক

এবং তার ফলশ্রুতিতে যে বিখ্যাত চারটি উপন্যাস সৃষ্টি হয়েছে, তাদের মধ্যে রয়েছে অদৃশ্য একই সুতোর বুনন। বিষয়বস্তুর রকমফের করে প্রায় একটি কাহিনিই যেন লেখক লিখে গেছেন। কখনও চরিত্র এক রেখে, কখনও প্রধান চরিত্রের ভূমিকা পাল্টে দিয়ে, কখনও কিছু চরিত্র-নাম পাল্টে দিয়ে লেখক নির্মাণ করেছেন এই উপন্যাসগুলো। এখানে হৃদয় নস্কর সরল এক ভাগচাষী। যার কাছে সংসারের সচ্ছলতা কল্পনাতীত কোনও বিষয়। তার সঙ্গে স্বভাব-চরিত্রে কিছুটা মিল রয়েছে তার বাবা খগেন নস্করের সঙ্গে। তবে বাবার সঙ্গে তার একটা বড় জায়গায় পার্থক্য আছে। বাবার মত প্রকৃতির অন্তর্চেতনা অনুভব করলেও সে বাবার থেকে বেশি আশাবাদী, ''বাতাসের চোকলা তুলে ভেতর থেকে আশার বীজ দেখতে পায়। এক রকমের আশার দানা। তাতে রং থাকে। আশার একটা নিজের গন্ধও আছে। ভালো সময়ের গায়ে হৃদয় নস্কর সব সময় বাসন্তী রং দেখতে পায়।''[১৫]

এই হৃদয় নস্কর তার ছোট ভাই বজরাকে সৎ করে তুলবার দায়িত্ব নেয়। এই 'সৎ' হবার বিষয়টি শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের অনেক উপন্যাসেই এসেছে। এই কাজে হৃদয় গ্রামের সকল মানুষের সাহায্য চায়। অন্যদিকে ব্রজেশ্বর হাজরা তার দাদার একেবারেই বিপরীত চরিত্রের মানুষ। বিভিন্ন সমাজবিরোধী কাজের সঙ্গে যুক্ত। এতে আফসোস তো দূরের কথা, তার গর্ব হয়। কিন্তু ধীরে ধীরে দোর্দণ্ডপ্রতাপ ডাকাত বজরার জীবনেও পরিবর্তন আসে। এই পরিবর্তনের কাহিনি নিয়েই উপন্যাসটি নির্মাণ করেছেন লেখক।

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের রচনাসম্ভারে বিষয়বৈচিত্র্যের অন্যতম দৃষ্টান্ত হলো 'নতুন ভবন' (১৯৭৩) উপন্যাসটি। কল্পবিজ্ঞানকে কেন্দ্র করে এই উপন্যাসটি নির্মিত হয়েছে। তবে লেখক শুধু অনাগত সময়ের বিজ্ঞানকে কল্পনা করেননি— সেই সময়ে মানুষের জীবনধারারও পরিচয় দিয়েছেন। ফলে এই রচনায় একদিকে যেমন উঠে এসেছে আগত ভবিষ্যের বিজ্ঞান-প্রযুক্তির দুর্নিবার গতি অন্যদিকে সেই সময়ের সঙ্গে অভিযোজিত আর অভিযোজিত হতে না পারা মানুষদের চিন্তা-ভাবনা। উপন্যাসটির কাহিনিকাল ইন্দিরা গান্ধির জন্ম শতবর্ষ অর্থাৎ ২০১৬-২০১৭খ্রিস্টাব্দ নাগাদ। এই সময় ঔপন্যাসিক প্রবোধ বিশ্বাস উপন্যাস লিখতে বসেছেন। সেই সূত্রেই উঠে এসেছে তৎকালীন সময়ে বিজ্ঞান- প্রযুক্তির অভাবনীয় উন্নতি, এই উন্নতিকে হাতিয়ার করে রাষ্ট্রশক্তির আরও ক্ষমতাধর হয়ে ওঠা, উন্নত বিজ্ঞানের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া, রাষ্ট্রের সমাজজীবনকে একেবারে সমস্যামুক্ত করতে চেয়ে নতুন কিছু সমস্যার সৃষ্টি করা। এই সময়ের সঙ্গে মিশে রয়েছে প্রবোধ বিশ্বাস ও তার দাদা-ভাইদের অতীত স্মৃতিচারণ বিশেষত হেমন্ত বিশ্বাস (তৃতীয় সন্তান)-এর আত্মহত্যাকে কেন্দ্র করে, পরিবর্তিত সময়ে প্রবোধ বিশ্বাস ও দাদা-

ভাইয়েদের খাপ খাওয়ানোর চেষ্টা। প্রত্যেক ভাইদের সংসার জীবনের টুকরো ছবি এবং কাহিনির শেষ অংশে প্রবোধের দাম্পত্য জীবনের স্মৃতি।

তখন কলকাতা সম্প্রসারিত হতে হতে আসানসোল থেকে বনগাঁ পর্যন্ত ছড়িয়েছে। যোগাযোগ ব্যবস্থার ক্ষেত্রে এসেছে আমূল পরিবর্তন। আগেকার মোটর ট্যাক্সিগুলো শহরের বাইরে রিক্সার বদলে চলে। শহরে চলে আকাশপথে হেলিট্যাক্সি যার ইন্ধন পরমাণু শক্তি। ওভারহেড এক্সিডেন্ট প্রায় শূন্য। গহনার ক্ষেত্রে সোনার জায়গা নিয়েছে প্লাটিনাম। বাঁধ-পরিকল্পনা এত সফলভাবে রূপায়িত হয়েছে যে নদীগুলো আবার জলে ভরে উঠেছে। এখানে না থেমে বিশেষজ্ঞরা মুকুন্দরামের চন্ডীমঙ্গল পড়ে পড়ে পুরানো নদীগুলোর খোঁজ করছেন যাতে সেখানেও জল চালান দেওয়া যায়। আকাশের চাঁদ এখন একটি স্টেশন যেখানে গবেষণার জন্য বিজ্ঞানীদের অবাধ যাতায়াত। অতিকায় ভ্যাকাম ক্লিনারের সাহায্যে প্রতিনিয়ত এলাকা পরিষ্কার করা হয়। শিক্ষাক্ষেত্রেও উন্নতি হয়েছে। পড়াশোনা করার জন্য এখন আর প্রাইভেট টিউটরের দরকার কোনও ধরনের ছাত্রদের প্রয়োজন হয় না। 'ই-লার্নিং' এখন শুধু উন্নত দেশের করায়ত্ত নয়। শিক্ষকদের জায়গা দখল করেছে কম্পিউটার। 'হিউম্যান এরর' শব্দটি মানুষ ভুলে যেতে বসেছে। সব কিছুই পূর্ব-পরিকল্পিত। শুধু দরকার সেই পরিকল্পনা (রাষ্ট্র নির্ধারিত ও নিয়ন্ত্রিত) মতো মানুষদের এগিয়ে যাওয়া নিজের কোনও প্রয়োজনাতিরিক্ত (রাষ্ট্র মতানুসারে) বুদ্ধি না প্রয়োগ করে। ঘাসের বদলে গরুর খাদ্য হয়েছে নিউজপ্রিন্ট। তাই দুধের রঙ আগের চেয়ে অনেক সাদা।

তবে বৈপ্লবিক পরিবর্তন হয়েছে স্বাস্থ্যক্ষেত্রে। এখন আর কোনও অসুখ মানুষকে যমের দুয়ারে পাঠাতে পারে না। সব ধরনের অসুখের জন্য ওষুধ সর্বদা প্রস্তুত। তাই 'ইন্‌কিওরেবল্' বলে কোনও অসুখ আছে কিনা, তা বর্তমানে গবেষণার বিষয়। ক্যান্সারের মতো মারণব্যাধি এখন ইতিহাস। ওষুধের সাহায্যে বার্ধক্যে ও যৌবনে বিশেষ পার্থক্য নাই। মানুষের ন্যূনতম গড় আয়ু হয়েছে একশো বছর। বাতাবি লেবুর খোসা থেকে তৈরি হওয়া ওষুধে জন্মনিয়ন্ত্রণ, পরিবার-পরিকল্পনা এখন হাতের মুঠোয়। তাই গত বিশ বছরে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে ভারতের জনসংখ্যা। কিন্তু এত কিছুর মাঝেও 'আত্মহত্যা' মড়কের মতো দেখা দিয়েছে। তবে আশ্চর্যের বিষয়, যেসব কারণে আগে মানুষ আত্মহত্যা করত তার একটা কারণও বর্তমান নেই। শীতকালে এই ছোঁয়াচে রোগের বৃদ্ধি ঘটে। অবশ্য সরকার এই রোগকেও নির্মূল করতে উঠে পড়ে লেগেছে। 'পোলিও'র টিকার মতো বাজারে এনেছে 'প্রফুল্ল'— ট্যাবলেটগুলোর নাম 'খুশি'। কিন্তু 'প্রফুল্ল', 'খুশি'-র অতিরিক্ত ব্যবহার বা অপ্রয়োজনীয় ব্যবহার

সমাজে সৃষ্টি করেছে এক নতুন সমস্যা। তৈরি হয়েছে স্মৃতিভ্রষ্ট বিগতবুদ্ধি জড়ভরতের দল। আত্মহত্যার মতো এই বিষয়টিও সরকার এখনও পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ করতে পারেনি। জড়ভরতদের সংখ্যা ক্রমশ বর্ধমান— শহরের বাইরের বনগুলো তাদের আশ্রয়স্থল। রাষ্ট্রশক্তির নিয়ন্ত্রণে যা নেই—তা মুছে ফেলাই রাষ্ট্রশক্তির এখন অন্যতম কাজ। বিজ্ঞানের সৌজন্যে মানুষের শুভ্র শোণিতের গোপন রহস্য জানার পর কতিপয় শক্তিশালী মানুষ মিলে পেছন থেকে রাষ্ট্রকে চালায়। তাদেরই উদ্যোগে পছন্দমতো মানুষ বানানো হচ্ছে। যাদেরকে বলা হয় বিবেকবান বাহিনী (বি.বি.বি)। প্রবোধের মতে এরা আসলে বিবেকহীন বাহিনী। কারণ রাষ্ট্র তাদেরকে দিয়ে ইচ্ছেমতো কাজ করিয়ে নেয়। তারা ভাবনা-চিন্তা করতে পারে না— ভালো-মন্দ, সাদা-কালোর কোনও ফারাক বোঝে না।

মানুষের স্বপ্ন রেকর্ড করা এই সময়ে এক রকমের ব্যাবসা। ফলে স্বপ্ন পেটেন্ট করাতে হয় যাতে অন্য কেউ চুরি করতে না পারে। প্রবোধ বিশ্বাস নিজেই 'ফরওয়ার্ড ড্রিমস' নাম দিয়ে ব্যাবসা শুরু করে। পৃথিবী জুড়ে যে কজন আগাম স্বপ্ন দেখা শুরু করে, সেই সব জীবনরহস্য সন্ধানী ড্রিম মারচেন্টদের সম্মেলনে তৈরি হয় সমগ্র ভাবনা-চিন্তা-স্বপ্নের সংকলন। এটা রাষ্ট্রের হাতে চলে যেতেই তারা নিজেদের পছন্দমতো মানুষ তৈরি করার সূত্র পেয়ে যায়। সৃষ্টি হয় রাষ্ট্রীয় ক্যাডার বাহিনী বি.বি.বি.। যার মূল কাজই হলো জড়ভরতের দলকে নিশ্চিহ্ন করা। অবশ্য রাষ্ট্র মানুষকে সমৃদ্ধশালী হবার নানান পথ তৈরি করে দিয়েছে। তাদেরকেই তারা নিশ্চিহ্ন করতে চায় যারা অবাধ্য, যাদেরকে নিয়ন্ত্রণ করা যায় না। কিন্তু এই সমৃদ্ধি মানুষের জীবনে নিয়ে আসে অঢেল অবসর। আর যে অবসর পাবার জন্য অতীতে কর্মব্যস্ত মানুষ মাথাখুঁড়ে মরত, সেই অবসর বর্তমান মানুষদের কাছে শত্রু হয়ে দাঁড়াল। কারণ অঢেল অবসরেই মানুষ আরামে-বিরামে অবসন্ন, বিষণ্ণ হয়ে পড়ে। আর এই অবসন্নতা আত্মহত্যার প্রধান কারণ হয়ে ওঠে। কাহিনির শেষে দেখা যায় প্রবোধ জড়ভরতদের সঙ্গেই থাকতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে। এই রকম বিষয় নিয়ে লেখকের আর কোনও উপন্যাস আমরা পাই না। তাই বিষয়বৈচিত্র্যে 'নতুন ভবন' অদ্বিতীয়তম।

'চম্পাহাটি পর্ব' পরবর্তী সময়ে লেখক পুনরায় নগর কলকাতায় এসে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। ফলে এই সময়ের লেখায় আবার ধরা দিতে শুরু করেছে নাগরিক জীবনের নানান জটিলতা, সমস্যা ও সম্ভাবনা। সেই সঙ্গে মিশে থাকছে নগর কলকাতার ভিন্ন ভিন্ন রূপ। এই ধরনের লেখার যাত্রাপথে প্রথম যে উপন্যাসটি পাই, তা হলো 'স্বর্গের পাশের বাড়ি' (১৯৭৮)। বিভিন্ন বয়সের মানুষের জীবনকে পাশাপাশি রেখে কাহিনি নির্মাণ করেছেন লেখক। প্রতিটি চরিত্রই একে

অপরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। কাহিনি শুরু হচ্ছে তিয়াত্তরের বৃদ্ধ গিরিশচন্দ্র রায়ের কাহিনি দিয়ে। এরপর কাহিনিকে এগিয়ে নিয়ে গেছে গিরিশচন্দ্রের ছোট ছেলে ভূদেব, ভূদেবের বন্ধু একদা সফল সিনেমা ডিরেক্টর সুখেন দত্ত, তার দাদা নবীন দত্ত, সুখেন দত্তের ছেলে গজেন্দ্রনাথ (গজা), গজার প্রেমিকা সরমা, ব্যাংকের চেয়ারম্যান শ্রীনাথ পুরকায়স্থ ও একদা ভারতীয় সিনেমার গ্ল্যামার কুইন সুরেখা দেবী। এদের প্রত্যেকের জীবনের বিভিন্ন অংশ নিয়ে লেখক যেন একটি নগরজীবনের কোলাজ তৈরি করেছেন। তবে গ্রামীণ জীবনের রেশ লেখক তখনও হয়তো পুরোপুরি কাটিয়ে উঠতে পারেনি। তাই কলকাতার রূপ ফুটে উঠেছে এভাবে, ''কলকাতা আসলে কোনো শহর নয়। বড় সাইজের একটা অগোছালো গ্রাম। কেননা, এই এখানে দাঁড়িয়ে লেনসের ভেতর দিয়ে গজা পাশাপাশি এইটিনথ, নাইটিনথ, টোয়েনটিনথ আর টোয়েনটিফার্স্ট সেঞ্চুরি দেখতে পাচ্ছিল। গরু চরানো দুর্গের মাথায় পতাকা, মেয়েলোকের বল খেলা, কাচের তৈরি দোতলা রেস্তোরাঁ। গজা জানে রেস্তোরাঁর নিচেই গঙ্গার ঘাটে গুরুদশার শেষে কোনো হিন্দু হয়ত ঘাট কামাতে বসেছে। ঋত্বিক ঘটকও এ কলকাতাকে কোনোদিন তুলে আনতে পারেননি। এই কলকাতা আসবে জি দত্তের ছবিতে— আস্ত। আগাগোড়া।''[১৬]

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাসগুলো কাহিনির পটভূমিরূপে মূলত গ্রাম ও নগরজীবনের চেনা পরিবেশ ব্যবহৃত হলেও এমন অনেক উপন্যাস রয়েছে যেখানে আমরা দেখতে পাই কিছুটা অল্প-পরিচিত বা অচেনা পটভূমি। এই উপন্যাসগুলোতে ঐ অঞ্চলগুলোর বিশেষত্ব কাহিনিগুলোর মধ্যে স্বতন্ত্র জায়গা করে নিয়েছে। যেমন— 'পরীর সঙ্গে প্রেম' (ডুয়ার্সের চা বাগান), 'মহাজীবন' (আসানসোলের কয়লাখনি অঞ্চল), 'স্বর্গে তিন পাপী' (কোনারক), 'একদা ঘাতক' (পুরী), 'এক সিংহ ও তার রমণী' (গির অভয়ারণ্য), 'বড় হওয়ার আগে' (শান্তিনিকেতন), 'সুধাময়ীর দিনলিপি' (কালাহাণ্ডি), 'কহেল গাঁও' (সাওতাল পরগণা)।

'মহাজীবন' (১৯৯৫) উপন্যাসে আসানসোলের নিরসা খনি অঞ্চলের কথা হয়েছে। যদিও কাহিনির মাঝখানে প্রবেশ করেছে বিহারের একটি প্রত্যন্ত গ্রাম 'জেন্দাহা'-এর পটভূমি। এই গ্রামের সুবাদে সেই অঞ্চলের মানুষদের জীবনযাত্রা, তাদের সামাজিক রীতি-নীতি, আচার- বিচার ইত্যাদির বিশ্বাসযোগ্য তথ্য এই উপন্যাসে ফুটে উঠেছে। মূল কাহিনি নির্মিত হয়েছে সাংবাদিক রজত পালিতকে কেন্দ্র করে। ' এখন' পত্রিকার পক্ষ থেকে ক্যামেরাম্যান বিশুকে সঙ্গে নিয়ে রজত কলকাতা থেকে এসে পৌঁছেছে আসানসোলে অগ্নিবিধ্বস্ত নিরসা কয়লাখনি অঞ্চলে। তবে কয়লাখনির আগুন লাগার সাধারণ খবর করা রজত পালিতের মূল উদ্দেশ্য নয়। আসল উদ্দিষ্ট, ''এমন মৃত্যুর থাবা কতটা বড়—

তার পরিণাম কতখানি— যাদের গেল— তাদের কতটা গেল।”[১৭] এই বিষয়টি লেখার মধ্যে তুলে অন্য একটি দৃষ্টিকোণের সৃষ্টি করাই তার ইচ্ছা। এই কাজ করতে গিয়ে রজত পালিত জড়িয়ে পড়ে খনির আগুনে দগ্ধ হওয়া রামটহল দুসাদের পরিবারের সঙ্গে। ক্যামেরাম্যান বিশু কলকাতায় ফিরে গেলেও ফেরা হয় না রজতের। মৃত রামটহল দুসাদের স্ত্রী চামেলীর মধ্যে নিজের মেয়ে ইরাকে অনুভব করে সে। ইরার বিবাহ পরবর্তী সময়ে যে পিতৃত্ব অভুক্ত অবস্থায় মৃতপ্রায় হয়ে গিয়েছিল— চামেলীকে দেখার পর রজত পুনরায় বেঁচে থাকার স্বাদ ফিরে পেতে শুরু করে।

আসলে শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় এই উপন্যাসে দেখিয়েছেন কীভাবে একটি মানুষ বিভিন্ন সম্পর্কের (যেমন— স্বামী, পিতা ইত্যাদি) বন্ধনে থেকেও সেই মানুষটির কাছে একটা সময় এই সম্পর্ক গুলোর রস শুকিয়ে যেতে থাকে। ফলে আগের মতো টান অনুভব করা যায় না। যেমনটা হয়েছে রজত পালিতের সঙ্গে। স্ত্রী ছায়ার সঙ্গে একটানা চৌত্রিশ বছর সংসার করার পরে আজ স্বামী রজতের মনে হয়েছে, তারা এতদিন জীবন কাটিয়েছে অনেকটা রুমমেটের মতো করে। যে ইরাকে সে ভালোবাসত এবং পিতা রজতের সর্বদা মনে হত তাকে ছেড়ে ইরা কখনও থাকতে পারবে না— সেই মেয়ে ইরা অল্প বয়সে ভালোবেসে অভিষেকের সঙ্গে বিয়ে করে সন্তানসহ দিব্যি সংসার করছে। রজতের মধ্যে একটা প্রচ্ছন্ন অহংকার ছিল যে, সে যে সংবাদপত্রের সঙ্গে যুক্ত, যেখানে তার লেখা বের হয়— সেই কাগজ উঠে যেতে পারে না। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় সেই কাগজ উঠে যায় এবং সাংবাদিক রজত অবসরকালীন পি.এফ.,গ্যাচুইটির টাকাও পায় না। ফলে তাকে বিনা ডেজিগনেশনে ‘এখন’ পত্রিকায় কাজ নিতে হয়। তবে এই সবের মধ্যে যেটা বড় হয়ে উঠেছে, সেটা হলো রজতের পিতৃত্ববোধ, ‘‘ একদিন আমার মেয়ে ছিল। এখন সে অভিষেকের বউ। শঙ্কু-চিনির মা। আমরা— আমি সেখানে রিডানডেন্ট। আমরা মনে মনে সেই ইরাকে ভাবি— যে ফ্রক পরে মাথার চুল দুলিয়ে ছুটে আসত— বাবা কী এনেছ দেখি— বলে ঝাঁপিয়ে পড়ত। সে ইরা তো আর নেই। চিরকাল কি মানুষ একরকম থাকে!

কিন্তু আমি যে দিনকে দিন একা হয়ে গেলাম ছায়া। আমার কাজের জায়গা এক বিরাট শূন্য। বাড়ি ফিরে এসে সেই আনন্দ আর পাই না।”[৩১৮] রজত পালিতের এই একাকীত্ব, মেয়ের ছোটবেলার স্মৃতিতে আটকে থাকা— বিধবা চামেলী দুসাদের মধ্যে পিতার নির্ভরশীলতা পাবার আকুলতা; ফলে চামেলী দুসাদের পরিবারের সঙ্গে জীবনের কিছুটা অংশ একজন বাবা হিসেবে তাদের মতো ব্যয় করা এবং শেষে চামেলী যখন পুনরায় ফৌজদারের সঙ্গে নতুন জীবন শুরু করবে— সেই বিষয়টি পাকা

বন্দোবস্ত করে আবার পথে নামা, এই বিষয়গুলো নিয়েই উপন্যাসটি নির্মিত হয়েছে।

''সত্তরের দশকটি ধরে মুক্তির সাধনা বিচিত্র পথে চলেছে। এই নিয়ে লেখা খুব কম হয়নি। সবরকমের বাদের চেয়ে মানুষ সর্বদাই বড়। মানুষের এই বড় হয়ে যাওয়ার ব্যাপারটিই তুলে ধরতে চেয়েছি। মানুষের কথাই সর্বশিল্পে চিরায়তের তিলক।''[১৯] এই মন্তব্যটি শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর 'একদা ঘাতক' উপন্যাসের ভূমিকাতে বলেছেন। বাংলায় সত্তরের দশকে যে অগ্নিগর্ভ নকশাল আন্দোলনের জন্ম হয়েছিল সেই প্রসঙ্গ এই উপন্যাসের প্রেক্ষাপট নির্মাণে সাহায্য করেছে। কলকাতা থেকে কিছুটা দূরে পুরীর সমুদ্রের সামনে লেখক তিনটি চরিত্রকে দাঁড় করিয়েছেন। একজন একদা নকশাল-বিপ্লবী জেলখাটা সুকুমার রায় যার বর্তমান পেশা আঙ্কুপাংচারের মাধ্যমে চিকিৎসা করা। দ্বিতীয়জন সুধীন দত্তের পঙ্গু মেয়ে রাধা দত্ত, ছোটবেলায় মালসাঁর আগুনে পা পুঁড়ে গিয়ে পঙ্গু হয়ে যায়। আর তৃতীয়জন হলো সুধা যার এ.এস. আই (পুলিশ) স্বামী নকশাল-বিপ্লবীদের হাতে মারা যায় বিয়ের মাত্র আট মাসের মাথায়। এরাই এই উপন্যাসের প্রধান তিনটি চরিত্র। এই তিনজনের ইতিহাস কাহিনির পরতে পরতে উন্মোচন করে লেখক একটি রোমাঞ্চের আবহ তৈরি করেছেন।

রাধার চিকিৎসা করতে গিয়েই সুকুমারের সঙ্গে রাধার প্রথম পরিচয়। সেখান থেকেই প্রেম— দু'জনেই অন্ধকার, স্থবিরতা থেকে আলো, চঞ্চলতার নতুন জীবন শুরু করার স্বপ্নে বুঁদ। এই প্রচেষ্টার অঙ্গ হিসাবেই সুকুমার রাধাকে নিয়ে এসেছেন পুরীর সমুদ্রের ধারে। যেখানে সে রাধাকে পুনরায় হাঁটার অভ্যাস তৈরি করতে সাহায্য করে। অন্যদিকে একেবারে বিপরীত পরিস্থিতিতে সুধার পুরীতে আগমন। স্বামী-মৃত্যুর পর একলা বিধবা সুধা অনন্যোপায় হয়ে শেষপর্যন্ত পেট চালাবার দায়ে বেশ্যাবৃত্তিকেই গ্রহণ করে। লজের মালিক নৃপেনবাবুর সঙ্গে দু'সপ্তাহের চুক্তিতে কলকাতার বড়াল পাড়া থেকে সুধা পুরীতে আসে। সমুদ্র স্নানের সময়েই সুধা চিনতে পারে তার স্বামীর একদা ঘাতক সুকুমারকে। তারপরেই সুকুমারের প্রতি সুধা ঘৃণা, প্রতিশোধে ভাসতে থাকে। অন্যদিকে সুধার পরিচয় জানার পর সুকুমারের মন বিষাদে ভরে ওঠে। লেখক জানান, ''তিনজন তিন ঢেউয়ের মানুষ। তারা ভালোবাসা, ঘৃণা, বিষাদ আর প্রতিশোধে ভাসতে ভাসতে একটি বিন্দুতে এসে দাঁড়িয়েছে।''[২০]

সুধার প্রতিশোধস্পৃহা সুকুমার ও রাধার নতুন জীবনের পথে অন্যতম বাধা। সুকুমার বুঝতে পারে এক্ষেত্রে সুধার স্মৃতি তার প্রধান শত্রু। কারণ স্মৃতি অবিনাশী। একজনের স্মৃতিনাশ করতে পারলেই তাদের (সুকুমার ও রাধার) নতুন জীবন শুরু করার পথে কোনও বাধা থাকে না। সুকুমার সেই ধরনের পরিকল্পনাই গ্রহণ করে। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা যায় সুধার প্রতিশোধ স্পৃহার চাপ সহ্য

করতে না পেরে সুকুমারের নিজেরই স্মৃতি নষ্ট হয়ে যায়। ভালোবাসা, ঘৃণা, বিষাদ ও প্রতিশোধে দোলাচল জীবনের কাহিনিই তুলে ধরেছেন লেখক 'একদা ঘাতক' উপন্যাসে।

'এক সিংহ ও তার রমণী' (২০০১) উপন্যাসে আমরা দেখতে পাই গির অভয়ারণ্যের পরিবেশ। বাংলা সাহিত্যে অনেক রচনাতেই নারীর সঙ্গে নাগিনীর তুলনা রয়েছে। নাগিনীর সঙ্গে পুরুষের সঙ্গমচেতনার প্রসঙ্গও উঠে এসেছে। আর এই উপন্যাসে এক পুরুষ সিংহের (যাকে গ্রামবাসিরা নাম দিয়েছে 'বুধুয়া') সঙ্গে এক রমণীর ঘনিষ্ট সম্পর্ক দেখতে পাই। অজয় সোম এই গির অভয়ারণ্যের একজন পদস্থ অফিসার। তার প্রথম স্ত্রীর মৃত্যুর পর প্রথম পক্ষের সন্তান অলক সোমের উদ্যোগেই দ্বিতীয়বার বেশি বয়সে বিয়েতে বসে অজয় সোম। বিয়ে হয় জাতীয় স্তরের অ্যাথলিট রজনীর সঙ্গে। অন্যদিকে রজনীর দীর্ঘদিন বিয়ে না করার কারণ হিসেবে উঠে আসে অনেকদিন আগে তার প্রেমিক পরিতোষের বোমার আঘাতে মৃত্যুর ঘটনা। তবে এটি নিছক দূর্ঘটনা ছিল না, রজনীর এক গুপ্ত প্রেমিক অশোক রজনীকে পাওয়ার জন্যই পরিতোষের গায়ে বোমা ফেলে। এতদিন পরে পরিতোষের মুখ আবছা হয়ে এলেও প্রেমের স্মৃতি ও সেই প্রেম পাবার আকুলতা এখনও রজনীর মধ্যে বিদ্যমান। তাই কাহিনির শেষদিকে আমরা দেখতে পাই রজনী সিংহ বুধুয়ার মধ্যে পরিতোষকেই দেখতে পায়। অন্যদিকে বুধুয়াকে লক্ষ্য করে রাইফেল তাক্ করা অজয় সোম যেন অশোকের ভূমিকা গ্রহণ করে রজনীর চেতনায়। যে রজনী একদা তার প্রেমিক পরিতোষকে বাঁচাতে পারেনি— সে এবার বুধুয়াকে বাঁচাতে বদ্ধপরিকর। তাই বেপরোয়া ভঙ্গিতেই অজয়ের তাক্ করা (বুধুয়ার দিকে) রাইফেলের সামনে দাঁড়িয়ে পড়ে। উত্তেজিত স্বরে যেন সর্বশক্তি দিয়ে অজয়কে গুলি না করতে বারংবার নিষেধ করে। কারণ রজনী বুধুয়ারূপী (সিংহ) পরিতোষকে এবার সারাজীবনের জন্য হারাতে কোনো ভাবেই রাজি নয়। আসলে লেখক এই উপন্যাসে এক অতৃপ্ত নারীর (শরীরে ও মনে) আকাঙ্ক্ষাকেই মূল উপজীব্য বিষয় করেছেন।

বয়ঃসন্ধিক্ষণে পা দেওয়া এক কিশোরের প্রেমে পড়া— প্রেমে প্রত্যাখ্যাত হওয়ায় কাহিনি বর্ণিত হয়েছে 'বড় হওয়ার আগে' (২০০১) উপন্যাসে। এখানে সতেরো বছর বয়সের সমীরের বয়সোচিত আবেগ, অনুভূতি, সমস্যা, চিন্তা-ভাবনা লেখক যেন ওই বয়সে বসেই লিখেছেন। জীবনের কঠিন বাস্তবতা সমীর তার স্কুলের হেডমাস্টারের মেয়ে কণার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের পর ধীরে ধীরে বুঝতে শেখে। বড় হওয়ার আগে তার এই অভিজ্ঞতা তাকে যেন বয়সে বড় হওয়ার অনেকটা আগেই বড় করে দেয়। কালাহাণ্ডির আরণ্যক পাহাড়ি পরিবেশের ছবি লেখক ফুটিয়ে তুলেছেন 'সুধাময়ীর

দিনলিপি' (১৯৯৭) উপন্যাসে। কালাহান্ডির করালকোটার বাঙলোতে বড় হয়ে ওঠা সুধাময়ী বন্দ্যোপাধ্যায় জীবনের শেষপর্বে এসে স্মৃতিচারণ করেছে ডায়ারির পাতায়। নগরজীবনের বাইরে এক আরণ্যক জীবন-কথা লেখক এখানে শুনিয়েছেন সুধাময়ীর জবানীতে। বাবা শিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাঠের ব্যবসা, দাদার বড় হয়ে ওঠা, দিদির বিয়ে, জামাইবাবুর পাগলামির রোগ ধরা পড়া, সম্পত্তি নিয়ে পারিবারিক বিবাদ, শিবদাসের মৃত্যুর পর করালকোটার জীবন ভেঙে যাওয়া ইত্যাদি নিয়েই গড়ে উঠেছে 'সুধাময়ীর দিনলিপি' উপন্যাসের কাহিনি। তবে এই উপন্যাসে কাহিনি ব্যতীত কালাহান্ডির প্রাকৃতিক ছবি অত্যন্ত জীবন্তভাবে ফুটে উঠেছে।

সময় বদলায়, শাসক বদলায়, মালিক বদলায়; বদলায় না জমি। তাই জমিকে কেন্দ্র করেই তৈরি হয় বিভিন্ন সময় দখলদারির নানান গল্প। এই দখলের গল্পই শুনি শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'কহেলগাঁও' (২০০৪) উপন্যাসে। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা পূর্ববর্তী নবাব আমলের ইতিহাস-প্রসঙ্গ এই উপন্যাসে এমন ভাবে জড়িয়ে আছে যে পাঠকেরা ঐতিহাসিক উপন্যাসের বাতাবরণের রোমাঞ্চ অনুভব করতে পারেন। সম্পত্তি বিনিময় করে যেসব মানুষ ওপার বাংলা থেকে ভারতবর্ষে এসেছিল, স্বরূপ তালুকদার তাদের মধ্যে একজন। ময়মনসিংহের পৈত্রিক সম্পত্তির বিনিময়ে তিনি পেয়েছিলেন সাঁওতাল পরগণায় নবাব ইসমাইল রেজা চৌধুরী নির্মিত কহেল গাঁও-এর প্যালেস। এছাড়াও নবাবের নানান জায়গায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা সম্পত্তি যার পুরো হদিশ স্বরূপ এখনও পর্যন্ত করে উঠতে পারেনি। স্বরূপের সঙ্গে অবসরপ্রাপ্ত কলেজ-বন্ধু রণেন ঘোষের কথোপকথনের মাধ্যমে উঠে আসে আইনি পথে বিনিময় হবার পরেও প্যালেসের অধিকার নিয়ে ঝামেলা, নবাবের জমিয়ে রাখা দলিল থেকে নবাবের সম্পত্তি খুঁজে বের করা, সেখানে অধিকার স্থাপনের সমস্যা, প্যালেসে আগে যারা বাস করত তাদের জড়িয়ে নানান ঘটনা। বর্তমানে এই প্যালেসকে সরকারি ট্যুরিস্ট স্পট বানাবার ইচ্ছা স্বরূপ তালুকদারের। দখল নেওয়ার প্রবৃত্তি মানব সভ্যতার ইতিহাসে একটা আদিমতম বিষয়। শুধু বদলে যায় সময়ের সঙ্গে পদ্ধতি। তাই লেখক জানান, ''দখল নেওয়া, দখলে রাখা, এসবে স্বরূপ কেন, যে কোনও মানুষই বীরের মত একটা সাহসী ভাবে ডুবে থাকে, একটা যেন ন্যায্য ন্যায্য সাহসী ভাব পেয়ে যায়। কেস, ডকুমেন্ট, এফিডেভিট, ভারডিক্ট, ডিক্রি—এসব কথায় যেন কেমন একটা তেজ আছে।

কথাগুলো যেন বুলেট বা কার্তুজ। একটা গাছ পর্যন্ত তার জায়গা ছাড়ে না। শিকড়ে সিধে দাঁড়িয়ে থাকতে চায়।''[২১] কাহিনির শেষদিকে আমরা দেখা পাই ঈশ্বরচন্দ্র মহাশয়ের সঙ্গে যাকে গঙ্গার

দু'পাশের লোক শুধু 'মশায়' বলে ডাকে। চারশ বছর আগে আকবর বাদশা মশায়ের পূর্বপুরুষকে 'মহাশয়' খেতাব দিয়ে গঙ্গার সোতা ধরে একশ তিরিশ মাইল জুড়ে জলকরে মাছ ধরার অধিকার দেন। সেই অধিকার বংশপরম্পরায় কমতে কমতে এখন বর্তমান মশায়ের দখলে রয়েছে পঞ্চান্ন মাইল। দখলের পরে আসে দখলে রাখার বীরত্ব ব্যাখ্যান। স্বরূপ ও মশায়ের আলোচনাতে এই প্রসঙ্গই উঠে আসে। এভাবেই দখলের গল্প বলে যান লেখক 'কহেলগাঁও' উপন্যাসে।

'অলীকবাবু' (১৯৮১) উপন্যাসে লেখক রমেন ঘোষের লেখক হয়ে ওঠার কাহিনিতে আমরা শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের নিজের জীবনের ছায়া দেখতে পাই। লায়ার থেকে লুস্কেন, লোফার হতে হতে লেখক হয়ে ওঠা। জীবনের পৌঢ়ত্বে এসে (প্রায় পঞ্চাশ) লেখক রমেন ঘোষ এভাবেই নিজের লেখক হয়ে ওঠার ঘটনার স্মৃতিচারণ করেছেন। তবে উপন্যাসের কাহিনি লেখক রমেন ঘোষকে নিয়ে নয় আবার তাকে বাদ দিয়েও এই কাহিনি বলা যাবে না। এখানে এক কেন্দ্রীয় চরিত্রে রয়েছে এক অলীক রমেন ঘোষ (উপন্যাসে প্রকৃত নাম নেই) যে কিনা আসল লেখক রমেন ঘোষের নাম নিয়ে মানুষ ঠকিয়ে বেড়ায়। আসল রমেন ঘোষ সুযোগের অপেক্ষায় থাকে মিথ্যা রমেন ঘোষের সঙ্গে দেখা করার জন্যে। সুদেষ্ণা দাশগুপ্তের সৌজন্যে কাকতালীয়ভাবে সেই সুযোগও এসে যায়। কারণ এই সুদেষ্ণাকে পুরীর হোটেলে একলা রেখে অলীক রমেন কিছু দিনের জন্য বেপাত্তা হয়ে গিয়েছিল। নিতান্ত বিপদে পরেই সুদেষ্ণা লেখক রমেন ঘোষের উদ্দেশ্যে চিঠি লেখে। সুদেষ্ণার চিঠি বুক পকেটে রেখে রাতের ট্রেন ধরেই আসল লেখক রমেন চলে আসে পুরীর সেই নির্দিষ্ট হোটেলে। ঘটনাচক্রে ঐ ট্রেনে করেই সুদেষ্ণার কাছে পুনরায় ফিরে আসে অলীক রমেন। হাতেনাতে ধরতে চেয়েও অলীক রমেনের সঙ্গে পরিচিত হয়ে (একজন গুনমুগ্ধ ভক্ত হিসেবে), সেই ইচ্ছা আর থাকে না। নাম ভাঁড়ালেও অলীক রমেনের মধ্যে আসল রমেন নিজের কম বয়সের রমেনকে উপলব্ধি করে যখন সে লায়ার থেকে ধীরে ধীরে লেখক হয়ে উঠছিল। আসল রমেনকে চিনতে পেরে তাই অলীক রমেন বলে, ''তখনই হয়ত লেখার কাঁচামাল আপনার স্টমাকে জমা হচ্ছিল। মনে মনে লিখতে শিখছিলেন। মানে মিথ্যেগুলো সাজাচ্ছিলেন। লোকের ওপর দিয়ে ঝালিয়ে নিচ্ছিলেন। তারপর 'আমি' হতে হতে হঠাৎ একদিন 'আপনি' হতে শুরু করলেন— রমেন ঘোষ হয়ে ওঠা আরম্ভ হয়ে গেলো আপনার। লেখা আপনাকে টাকা এনে দিল। যে-টাকার অভাবে আপনি মিথ্যে বলে যাচ্ছিলেন। সেই টাকা এসে আপনাকে ঘিরে একটা ইমেজ গড়ে উঠতে লাগল। যার অন্য নাম খ্যাতি। অথবা মানী হয়ে উঠতে লাগলেন। এরপর কি আপনি আর ভাসতে ভাসতে ডোবার সুযোগ পেয়েছেন? ডুবতে ডুবতে

ভাসার?"[২২] আসল রমেন ঘোষ এখানেই লেখক হিসাবে নিজেকে আয়নার সামনে দেখতে পায়। কারণ অনেক লেখকই একটি বয়স পার হয়ে এলে, খ্যাতি-প্রতিষ্ঠা পেয়ে গেলে, একটি লেখার জন্যে যে পরিশ্রম স্বীকার করতে হয়, তা করে না। ফলে চলতে থাকে চর্বিত চর্বণ— তৈরি হয় শব্দের অযথা পাহাড়। এভাবেই লেখক হয়ে ওঠা, লেখকের স্থবিরতা বিষয় হয়ে উঠেছে 'অলীকবাবু' উপন্যাসে।

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের আয়তনের দিক থেকে একটি অন্যতম বৃহৎ উপন্যাস হলো 'হাওয়াগাড়ি' (প্রথম খণ্ড-১৯৭৯ ও দ্বিতীয় খণ্ড-১৯৮০)। দু'টি খণ্ডে সাড়ে সাতশো পৃষ্ঠা নিয়ে এই উপন্যাসের কলেবর তৈরি হয়েছে। আমরা জানি, একই রকম চরিত্র, ঘটনা, প্রসঙ্গ লেখকের অনেক উপন্যাসেই ঘুরেফিরে আসে। আমাদের আলোচ্য উপন্যাসেও এর ব্যতিক্রম দেখতে পাই না। কারণ এই উপন্যাস পাঠে প্রথম খণ্ডে আমরা 'নির্বান্ধব' ও 'কুবেরের বিষয় আশয়' উপন্যাস দুটির ছায়া প্রতিফলিত হতে দেখি। গ্রামজীবনের কুবের যেন এখানে পরিণত হয়েছে নগরজীবনের দিলীপ বসুতে। আর এই দিলীপ বসুর মধ্যে এখানে লক্ষ্য করি নিবারণ পাকড়াশির নিঃসঙ্গতাবোধ। নগরজীবনের জটিলতা, কোলাহল, ষড়যন্ত্র, গোপন দ্বেষ, ল্যাং মেরে ফেলে দেবার প্রবণতার মাঝে দিলীপ বসুর হাসফাঁস অবস্থা। একজন কর্মদক্ষ মানুষকে (দিলীপ বসু) বসিয়ে বসিয়ে বেতন দিয়ে স্থবিরতার দিকে ঠেলে দেওয়া। তার কর্মদক্ষতাই হয়তো এই পচনশীল নাগরিক সমাজে তাকে নিঃসঙ্গ করে তোলে— প্রকৃত বন্ধুর অভাব তার মনের নিঃসঙ্গতাকে আরও বাড়িয়ে তোলে। যে উচ্চাকাঙ্ক্ষা, কাজ করার ইচ্ছা নিয়ে সে চাকরি জীবনে প্রবেশ করেছিল— সেই অফিসেই তার কর্মক্ষমতার সঠিক ব্যবহার হচ্ছে না। এক সৃজনশীল মানুষের সৃজনশীলতা নষ্ট ও অপচয় করার বিষয় নিয়েই তৈরি হয়েছে 'হাওয়াগাড়ি' উপন্যাসটি।

কোল ইণ্ডিয়া কোম্পানিতে যখন দিলীপ বসু কাজ করার সুযোগ পাচ্ছে না তখন কয়েকজন সহকর্মী মিলে গোপনে অন্য একটি কাজে ঝাঁপ দেবার পরিকল্পনা করে। অচল এক কয়লা খাদানকে দিলীপ বসু নিজের কর্মক্ষমতায় এমন এক জায়গায় নিয়ে যায় যে কোল ইণ্ডিয়ার মত কোম্পানিতে অজ্ঞাতকুলশীল ভৌমিক খাদানের কথা ওঠে। দিলীপ বসুর কর্মক্ষমতায় ভীত হয়েই যেন তার সহযোগীরা কোল ইণ্ডিয়ার উপরমহলে তার নাম ফাঁস করে দেয়। ফলে যে ভৌমিক খাদানকে কেন্দ্র করে দিলীপ বসুর সৃজনশীলতা পথ পেয়েছিল— সেই পথও বন্ধ হয়ে যায়। কিছু একটি গড়ে তোলার ইচ্ছা তখন পেশাগত জায়গা ছেড়ে অন্য জগতে প্রবেশ করে। পুরানো গাড়ি কিনে, তাকে নতুন রূপে

সজ্জিত করে, কিছুদিন ব্যবহার করে পুনরায় বেঁচে দেওয়া। কারণ দিলীপ বসুর সব সময় কিছু না কিছু বানাতে ইচ্ছে করে। এই বানানো বা গড়ে তোলার মধ্য দিয়েই তার শরীর দিয়ে সিক্রেশন হয়। এ ধরণের কাজ না হলে কাজে সে কোনো স্বাদ পায় না। পুরানো গাড়ির খোলনচে বদলানো প্রসঙ্গে দিলীপ জানায়, ''আবার ওরা চলুক। পৃথিবীর গায়ের ওপর দিয়ে ঘুরে ফিরে বেড়াক। হর্নের বদলে দমকলের ঘণ্টা বাজুক। স্টিয়ারিংয়ের পাশে বসুক— চিড়িয়াখানার হরিণের একটা বাচ্চা। তার গায়ে রোদ পড়ে পিছলে যাবে।''[২৩]

এই উপন্যাসে লেখক নকশাল আন্দোলনের প্রসঙ্গ এনেছেন দিলীপ বসুর ছেলে রবি নামক চরিত্রের মধ্য দিয়ে। নকশাল বিপ্লবীদের স্বপ্ন, লড়াই, কাজ করার পদ্ধতি রবির বিভিন্ন কথোপকথনে উঠে এসেছে। এই রবি খুন করে কালু ঘোষকে যে ছিল কলকাতার একজন কেউকেটা ব্যক্তি। কালু ঘোষের প্রিয় অস্টিন ট্যুরারটা কিনে নেয় দিলীপ বসু। এরপরেই মৃত কালু ঘোষের সঙ্গে দিলীপ বসুর বাস্তব-অবাস্তব মেশামেশি মিলে এক রোমাঞ্চকর যাত্রা শুরু হয়। তার যে একটা চাকুরে জীবন রয়েছে— সেটা যেন ইচ্ছাকৃতভাবেই ভুলতে শুরু করে দিলীপ। কোল ইন্ডিয়ার কর্তারা যেমন তার হাত থেকে রেহাই পেতে চাচ্ছিল তেমনি দিলীপ বসুও যেন কোল ইন্ডিয়া থেকে মুক্ত হতে চাচ্ছিল। সেই সময় ঘটনাচক্রে তার নাম একটি হত্যার অপরাধে জড়িয়ে পড়ে। যদিও পরবর্তীকালে ডাক্তারের রিপোর্টের মাধ্যমে সে নির্দোষ প্রমাণিত হয়ে মুক্ত হয়। কিন্তু ততদিনে তার চাকরি চলে গেছে। আর যে স্ত্রী তার কাছে ছিল 'শালগ্রামশিলা', সেই রাণী তার একদা প্রেমিক প্রবোধের সঙ্গে ঘর বাঁধে। নকশাল-বিপ্লবী ছেলে ফেরার, মেয়ে নিজের ইচ্ছামত একজনের সঙ্গে প্রাক-বিবাহ সম্পর্কে বাস করে। যে আশ্রয়কে তার এতদিন মনে হতো দীর্ঘদিনের অভ্যাস— এখন তার স্ত্রীর কাছে সেই আশ্রয় পাবার জন্যই দিলীপের আকুলতা দেখা যায়। খোঁজ নিয়ে দিলীপ জানতে পারল যে, তার স্ত্রী রয়েছে চন্ডীতলায়, রেল-কোয়ার্টারে। গিয়ে দেখল রাণীর গর্ভে তখন প্রবোধের সন্তান। ফলে রাণীর পক্ষে আর দিলীপের কাছে ফিরে যাওয়া সম্ভব নয়। পারিবারিক প্রায় সব সম্পর্ক থেকে এভাবেই দিলীপ বসুর বন্ধন আলগা হয়ে যায়।

প্রকৃত বন্ধুত্বের অভাবে দিলীপ বসু যে অশরীরী কালু ঘোষের সত্তাকে সৃষ্টি করেছিল তার মনের চেতনা থেকে, পুনরায় সেই কালু ঘোষই হয় দিলীপের সঙ্গী। এবার সে রবির ছেলে খোকনকে নিয়ে পৌঁছে যায় কালু ঘোষেরই জন্মভূমি গ্রামে। ত্রিশ বছর পর গ্রামের লোক তাকেই কালু ঘোষ বলে ধরে নেয়। অগোছালো, অলস গ্রামজীবন দেখে দিলীপের মধ্যে নতুন করে কিছু বানানোর অদম্য

ইচ্ছা পুনরায় জেগে ওঠে। দিলীপ বসুর জীবনের এই পর্বে আমরা 'ঈশ্বরীতলার রূপোকথা'র অনাথবন্ধুকে দেখতে পাই বা 'কুবেরের বিষয় আশয়'-এর চক্‌দার কুবেরকে। অনাথ বা কুবেরের মত কৃষিজীবনে মগ্ন হয়ে যায় দিলীপ বসু। শুধু তাই নয়, 'স্বর্গের আগের স্টেশন'-এর সাপ-ধরা খগেন ও 'চন্দনেশ্বর জংশন'-এর ওয়াগান-ব্রেকার বজরা চরিত্রের দেখা মেলে দিলীপ বসুর জীবনের এই পর্বে। কালু ঘোষের গ্রাম দেখে, তার ভাঙা বসতবাড়ি দেখে দিলীপ বসুর বড় চেনা মনে হয়। যেমনটা হয়েছিল কুবেরের মেদনমল্লর দুর্গ দেখে। দিলীপ বসু বানাবার ইচ্ছাশক্তিতে ভর করে জুটিয়ে নেয় শ'তিনেক বিঘার জমি। সকলে মিলে পতিত জমিকে পরিণত করে সুজলা সুফলা ধানক্ষেতে। ফলে দেখা যাচ্ছে, দিলীপ বসু বারবার ভেঙে পড়েও উঠে দাঁড়ানোর শক্তি একেবারে হারিয়ে ফেলে নাই। উঠে দাঁড়ানোর বিষয়টিই তো অনাদিকাল থেকে কর্মঠ সৃজনশীল মানুষের ঐতিহ্য। যারা আমৃত্যু কিছু বানিয়ে তোলার নেশায় সর্বদা বুঁদ হয়ে থাকে। কিছু বানিয়ে তোলার বিষয়টি তাদের কাছে অনিবার্য অমোঘ নিয়তি হিসাবে যেন ধরা দেয়। কিন্তু এবার তার প্রতিপক্ষ তার নিজেরই বিপ্লবী ছেলে রবি। যার ভাবনায় মানুষের ভালো করার পথে বাঁধা তার নিজেরই বাবা। আর রবির বাবা হিসেবে দিলীপ বসুর ভাবনা হলো মানুষকে নিশ্চিহ্ন করলেও তার স্মৃতি নষ্ট করা যায় না। এই দুই চিন্তার সংঘর্ষে পুত্রের গুলিতে নিজের তৈরি ধান ক্ষেতে লুটিয়ে পড়ে দিলীপ বসু। আর সেই সঙ্গে হয়তো পড়ে থাকল নতুন কিছু বানাবার অক্লান্ত উদ্যোগ, উদ্ভাবনী কৌশল, প্রকৃত বন্ধু পাবার তীব্র আকুলতা, একটি মনের নানান সৃজনশীল খেয়াল।

''এমন উপন্যাস আগে কখনো লিখিনি। ভেবেছি। সাহসে কুলোয়নি। তীরে দাঁড়িয়ে ভয় পেয়েছি। এত বিরাট। এত জটিল। মানুষের মন। ইতিহাসের বাঁকে বাঁকে। দেশের ধর্ম। দেশের মানুষ।"[২৪] 'শাহজাদা দারাশুকো' উপন্যাসের ভূমিকায় শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় একথাই বলেছেন। দু'টি খণ্ডে এগারোশো ষাট পৃষ্ঠা নিয়ে এই উপন্যাসটি লেখকের রচনাসম্ভারে আয়তনের দিক থেকে সর্ববৃহৎ উপন্যাস। শুধু তাই নয়, মোঘল ইতিহাসকে বিষয় করে লেখকের এটি একমাত্র সম্পূর্ণ ঐতিহাসিক উপন্যাস। ১৯৯১ সালের বইমেলায় পুস্তকাকারে এই উপন্যাসের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয়— দ্বিতীয় খণ্ড পরের বছরে। ১৯৯৩ সালে এই উপন্যাসের জন্যই শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় 'সাহিত্য একাদেমী' পুরস্কার পান। আমাদের আলোচ্য উপন্যাসটি এমন একজন ঐতিহাসিক মানুষের জীবনকে নিয়ে যাকে রবীন্দ্রনাথের ভাষা নকল করে বলা যায় 'ইতিহাস উপেক্ষিত চরিত্র'। শাহজাদা দারাশুকো যিনি মোঘল সম্রাট শাহজাহানের জ্যেষ্ঠ পুত্র হওয়া সত্ত্বেও দিল্লীর মসনদে বসতে পারেননি। এমন একজন মানুষের

জীবনেতিহাস তুলে ধরার কারণ হিসেবে লেখক জানান, ''শাহজাদা দারাশুকো হিন্দুস্থানে হিন্দু-মুসলমানের ধর্মচিন্তায় মিলনবিন্দুটি খুঁজতে গিয়ে সময়ের চেয়ে অনেক বেশি এগিয়ে যান। তাই তিনি হিন্দুস্থানের ইতিহাসে একটি কালো গোলাপ। ব্যথা, সৌন্দর্য, কালের ইতিহাসের সঙ্গে এই গোলাপ জড়িয়ে গেছে। হিন্দুস্থান যুগে যুগে তাঁকে বার বার আবিষ্কার করবে।''[২৫] আলোচ্য উপন্যাসে দারাশুকোর চরিত্রকে এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গিতে আবিষ্কার করে লেখক পাঠকের সামনে তুলে ধরেছেন।

উপন্যাসের কাহিনি শুরু হচ্ছে ১৬১৫ খ্রি. (১০২৪ হিজরি মহরম মাস) নাগাদ। আকবর বাদশার মৃত্যুর পর সিংহাসনে এখন বিরাজমান সম্রাট জাহাঙ্গীর যার বাদশাহী দশ বছরে পা দিয়েছে। ঢাকা থেকে কাবুল, কাশ্মীর থেকে বিজাপুর, গোলকুণ্ডা অব্দি চাঘতাই বংশের কাছে নতিস্বীকার করেছে। দারাশুকোর জন্ম হতে আরও কিছুদিন বাকি। সেলিমের চার সন্তানদের মধ্যে বড় ছেলে খসরু তারই নির্দেশে আজ অন্ধ। কারণ সে সিংহাসন লাভের জন্য বিদ্রোহী হয়েছিলেন। যদিও খসরুর চোখে আকন্দের আঠা লাগাবার নির্দেশ দেবার জন্য সেলিম পরে খুব অনুতপ্ত হয়েছিলেন। সেজো ছেলে পরভেজ অপদার্থ। আর ছোট ছেলে শারিয়ার নিতান্তই বালক মাত্র। তাই সম্রাট সেলিম জাহাঙ্গীরের বড় ভরসা একমাত্র মেজো ছেলে খুর্রম। তবে সম্রাটের প্রধান পরামর্শদাতা তার অন্যতম প্রিয় স্ত্রী নূরজাহান। বাজারে কানাঘুষো চলে, নূরজাহানই নাকি এখন হিন্দুস্থান চালায়। সম্রাট স্ত্রীর পূর্বনামে (মেহেরউন্নিসা) মোহর এনেছে বাজারে। আকবরি মোহরের খাতির ছিল সারা পৃথিবীতে— কিন্তু সম্রাট যে নতুন মোহর এনেছে বাজারে তার মূল্য আকবরি মোহর থেকে প্রায় অর্ধেক। ফলে বাজারমূল্য ও মুদ্রাস্ফীতি ঠিক রাখতে জাহাঙ্গীরের দিশেহারা অবস্থা। তার ওপর রাজত্বের নানান দিক থেকে বিদ্রোহ মাথাচাঁড়া দিয়ে উঠছে। বাদশা জাহাঙ্গীরের বেগম নূরজাহানের নেশায় বুঁদ হয়ে থাকার ফলেই রাজত্বের এই অরাজক অবস্থা। তবে তৎকালীন সময়ে একমাত্র মহাবৎ খাঁ বাদশাকে বাদশাহীর দুর্বল হবার কারণ চোখে আঙুল দিয়ে দেখানোর সাহস রাখে।

লেখক সপ্তদশ শতাব্দীতে মোঘল সম্রাট জাহাঙ্গীরের আমলে হিন্দুস্থানের নিখুঁত ছবি ফুটিয়ে তুলেছেন। সেই সময়কার মোঘল বাদশাহী নামক বিশাল কলেবরের রাষ্ট্রযন্ত্র—তার মনসবদার, জায়গীরদার, ঘোড়সওয়ার, আহেদি, ধানুকি, ওয়াকেনবীশ, সরবান, তশীলদার, রোজিনাদার, বন্দুকচী, আমির-ওমরাহ, উজির, উজিরে আজম, আতালিক, সুবেদার, ডিহিদার— সেই সঙ্গে ব্যাপারী, ভিখারী, চাষী, সন্ত, বেশ্যা, বাদী, গোলাম, নর্তকী, পাইক, পেয়াদা ইত্যাদি নিয়ে এক বিশাল ক্যানভাসে তৎকালীন সময়ের হিন্দুস্থানের ছবি। জাহাঙ্গীরের আমলে রাজস্বের ঘাটতি ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু বাদশা দশ

বছরের রাজত্বকালেই শাসক হিসেবে যেন ক্লান্ত। এখনি মনের মধ্যে ঘোরাফেরা করছে কার হাতে চাঘতাই বংশের পতাকা দিয়ে যাবে? কারণ বাদশাহীর চেয়ে মেহেরউন্নিসার প্রেমে মগ্ন থাকতেই ভালোবাসে বাদশা, ''আমি তো মেহেরকে ভালোবাসি। আমি খোদার দোয়ায় আওরত জানি। জানি ভালোবাসা। তার পাশে বাদশাহী কী এমন? ... তো তোমরা আমার বাদশাহী নিয়ে যা ইচ্ছে কুচ্ছ করো— তাতে আমার কী যায় আসে! আমি আশিক্। মেহের মাশুকা! বাকি হিন্দুস্থান গোল্লায় যাক্। তাতে আমার কী!''[২৬] এই প্রেক্ষাপটে আজমিরের শহরতলিতে হেকিম আবদুল হাজি সিরাজির হাতে আরজুমন্দ বেগমের গর্ভ থেকে জন্ম নেয় শাহজাদা খুর্রমের পয়লা আওলাদ যাকে সেলিম বাদশা নাম দিলেন 'সুলতান দারাশুকো'।

এরপর আমরা দেখতে পাই, হিন্দুস্থানের মসনদ দখল করার জন্য ষড়যন্ত্র, লড়াই, কূটনীতি। দক্ষিণের সুবেদার হয়ে শাহজাদা খুর্রম মালব ও গুর্জরের শাহী ফৌজকে সঙ্গে নিয়ে আগ্রার দিকে অগ্রসর হয়। তার আগেই অবশ্য খুর্রম বুরহানপুরের দুর্গে নিজের বড় ভাই খসরুকে নিজের হাতে গলা টিপে হত্যা করেছে। এদিকে আগ্রায় বাদশার দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে বেগম নূরজাহান যেনতেন প্রকারে মসনদের নিয়ন্ত্রণ নিজের হাতে রাখতে চায়, এমনকি যদি বাদশা জাহাঙ্গীরের মৃত্যু হয় তারপরেও। এই নূরজাহানের কূটনীতিতেই শাহজাদা খুর্রমের আগ্রা জয় সহজ হয় না। প্রায় জিততে জিততে প্রত্যেক যুদ্ধেই পরাজয় স্বীকার করতে হয় খুর্রমকে। শাহী ফৌজের তাঁড়া খেয়ে নানান দিকে পালাতে হচ্ছে— স্ত্রী আরজুমন্দ ও ছয় সন্তান নিয়ে পাহাড়ে, জঙ্গলে লুকিয়ে থেকেও লড়াই করে খুর্রম। শাহজাদার বাগী হবার দু'বছর পর সম্রাট সেলিম জাহাঙ্গীরের জরুরী তলবে মির্জা রঘুনাথকে ছুটে আসতে হয়েছে কাশ্মীরের বনিহাল দুর্গে। এখানেই মির্জা রঘুনাথের মাধ্যমে 'তুজুক-ই-জাহাঙ্গীর' লিখতে লিখতে সম্রাট সেলিম জাহাঙ্গীর ঢলে পড়ে মৃত্যুর কোলে। মেরে ফেলা হয় শাহজাদা পরভেজ ও শাহজাদা শারিয়ারকে। বন্দী হন বাদশা-বেগম নূরজাহান কাশ্মীরের দূর্গে। উজিরে আজম আসফ খাঁ-এর (খুর্রমের শ্বশুর) কূটনীতি ও সহযোগীতায় হিন্দুস্থানের মসনদে বসে খুর্রম— নাম হয় শাহজাহান। বাদশা-বেগম আরজুমন্দের নাম হয় মমতাজমহল। অবশ্য কিছুদিন পরেই একটি শিশু কন্যার (চতুর্দশতম সন্তান) জন্ম দিতে গিয়ে মৃত্যু হয় তার। ধীরে ধীরে শাহজাহানের সন্তানেরা বড় হতে থাকে। প্রথম আওলাদ দারাশুকো সাদিও করে ফেলেছেন করিমউন্নিসার সঙ্গে যার বিবাহ পরবর্তী নাম হয়েছে নাদিরা বেগম। প্রথম খণ্ডের সমাপ্তিতে শাহজাদা দারাশুকো সদ্য যুবক— বাদশা তাকে খেতাব দিয়েছেন 'ফৌজদার-ই-হিসার'।

উপন্যাসে আমরা বাংলা সুবার কথা বারবার পাই। কাহিনির শুরুতেই আমরা উত্তর-পূর্ব বাংলায় ব্রহ্মপুত্র নদের তীরে খুন্তাঘাটের গভীর জঙ্গলের কথা শুনি। সেখানকার অধিবাসীরা মূলত হাতিধরা ঘরদুয়ারি পাইক। এদের নেতা সনাতন পাইক তার স্ত্রী মীনাক্ষী আর দুই ছেলেমেয়ে বিষ্ণু আর লক্ষ্মীকে নিয়ে এই অঞ্চলে বাস করে। রাজপরিবারের কাহিনির সমান্তরালে আমরা এই বাঙালি পরিবারের কাহিনি দেখতে পাই। তার সঙ্গে জড়িয়ে আছে অবশ্য আহমেদি মীর সফির কাহিনিও। আবার লক্ষ্মীর মেয়ে রানাদিলের কাহিনি এখানে একটা অন্যমাত্রা জুড়ে দিয়েছে। এই রানাদিলের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সাক্ষাৎ ঘটে শাহজাদা দারাশুকোর। দারাশুকো ও রানাদিল-এর সম্পর্ক দারাশুকোর চরিত্রের একটি দিক উদ্‌ঘাটিত করেছে।

প্রথম খণ্ডে আমরা পেয়েছি এক থেকে তেতাল্লিশতম পরিচ্ছেদ আর দ্বিতীয় খণ্ডে রয়েছে চুয়াল্লিশতম পরিচ্ছেদ থেকে একশতম পরিচ্ছেদ। উপন্যাসের দ্বিতীয় খণ্ডেই শাহজাদা দারাশুকো প্রাধান্য লাভ করে। অন্যান্য ভাই-বোনের সঙ্গে তার বড় হয়ে ওঠা। অন্যান্য ভাই-বোনদের থেকে তার জ্ঞানলাভের প্রবল তৃষ্ণা, স্বভাব, আচার-আচরণ, চিন্তা-ভাবনা, মানস প্রবণতা পাঠকের সামনে নিখুঁত চিত্রকরের মত তুলে ধরেছেন লেখক। মোঘল বংশে আকবরের ভাবশিষ্য হবার একমাত্র দাবিদার হলেন এই দারাশুকো। লেখক জানান, ''দারাশুকো প্রেমের ভেতর, যুদ্ধের ভেতর, ষড়যন্ত্রের ভেতর ভাসতে ভাসতেও মানুষের ধর্ম খুঁজে বেড়িয়েছেন।''[২৭] কিন্তু কূটনৈতিক বুদ্ধি, রাজনীতির জটিল মারপ্যাচ না জানার ফলে জাগতিক বিষয়ে পরাস্ত হতে হয়েছে। তার দু'টি রূপ আমরা দেখতে পাই— একদিকে প্রেমিক দারা অন্যদিকে ধার্মিক দারা— মানবপ্রেম ও ঈশ্বরপ্রেম তার চেতনায় মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। অলৌকিকতায় তার বিশ্বাস থাকলেও আওরঙ্গজেবের মত তিনি ধর্মান্ধ ছিলেন না। যোদ্ধা হিসাবে নাম থাকলেও যুদ্ধের কৌশল তৈরিতে সেরকম পারদর্শী ছিলেন না। কিন্তু মানুষের প্রতি ছিল অপরিসীম ভালোবাসা ও বিশ্বাস। এর প্রতিদানে রাজপুতদের কাছ থেকে পেয়েছে বিশ্বাসঘাতকতা— আমির ওমরাহরাও সুযোগ বুঝে পাশ থেকে সরে দাঁড়িয়েছে। তাকে ধর্মদ্রোহী হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। দারাশুকোর প্রেমিক-সাধক রূপ বোঝার মতো সে সময় খুব কম মানুষই ছিল— যারা ছিল, তারা ক্ষমতালোভীদের কাছে নিরুপায়, অসহায়। লেখক জানান, ''সেসব আঁকতে গিয়ে সেদিনকার হিন্দুস্থানকে দেখতে পাই। সেই সময়— সেইসব মানুষজন তাদের কলরোল নিয়ে কয়েক শতাব্দী পেছনে সময়ের ধুলোয় চাপা পড়ে আছে। সেই ধুলো সরিয়ে দেখতে গিয়ে তাদের ক্ষোভ, দুঃখ, ঈর্ষা, অভিমান, ভালবাসা, ঘৃণা—সবই দেখতে পাই। সাধ্যমত তা আঁকার চেষ্টা করেছি।''[২৮]

দু'টি খণ্ডে প্রকাশিত 'আলো নেই' উপন্যাসটিতে শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় বিষয় করেছেন অখণ্ড ভারতবর্ষের অবিভক্ত বাংলার এক অস্থির গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক কালখণ্ডকে। দেশ স্বাধীন হতে আর বেশি দেরি নয়। কিন্তু স্বাধীনতার আনন্দকে ছাপিয়ে গেছে আসন্ন দেশভাগের মর্মান্তিক যন্ত্রণা— ভিটেমাটি, শেকড়সহ উপরে ফেলার বেদনা। তৎকালীন বঙ্গের রাজনীতিতে কোথাও আশার আলো দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। কবি জীবনানন্দের ভাষায় এই পরিস্থিতি সম্পর্কে বলা যেতে পারে, ''বাংলার লক্ষ গ্রাম নিরাশায় আলোহীনতায় ডুবে নিস্তব্ধ/নিস্তেল।'' ('১৯৪৬-৪৭' কবিতা) শুধু তাই নয়, ধর্মকে রাজনীতির মাঠে হাতিয়ার করে একদল মানুষ গ্রামে-গ্রামে, শহরে-শহরে ছড়িয়ে দেয় বিভেদ-বিভাজনের কু-মন্ত্রণা। ফলস্বরূপ ভালোবাসার জায়গা নেয় দ্বেষ, সহাবস্থানের জায়গা নেয় দাঙ্গা। প্রথম খণ্ডের কাহিনি শুরু হচ্ছে ১৯৩৭ খ্রি. থেকে। ভারতবর্ষের সবচেয়ে বড় রাজনৈতিক দল কংগ্রেস পরাধীন ভারতবর্ষে কোন কাজকে অগ্রাধিকার দেবে— সে বিষয়ে দিশেহারা। ফলে রাজনৈতিক আন্দোলন শক্তিশালী করতে পারছে না। যে ভূমি-সংস্কার গ্রাম-বাংলার মানুষকে অর্থনৈতিকভাবে শক্তিশালী করতে পারত, তা করতে ব্যর্থ হয়েছে কংগ্রেস। ফলে কংগ্রেস দলের আবেদন হ্রাস পেতে শুরু করে সাধারণ গ্রামীণ মানুষের কাছে। সেই সুযোগে ধর্ম-সাম্প্রদায়িকতাকে পুঁজি করে মুসলিম লিগ ও হিন্দু মহাসভার মত দলগুলোর জনপ্রিয়তা ক্রমশ বৃদ্ধি পায়। কমিউনিস্ট পার্টি, সোস্যালিস্ট পার্টি সহ বামপন্থী সংগঠনগুলো সারা দেশের প্রেক্ষিতে এত দুর্বল যে, তাদের চিন্তা-ভাবনা সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছায় না। এরকম প্রেক্ষাপটে আবুল কাশেম ফজলুল হকের কৃষক প্রজা পার্টি ভোটে জিতে কংগ্রেসের সঙ্গে কোয়ালিশন সরকার গড়তে প্রস্তাব দেয়। কিন্তু কংগ্রেসের মধ্যেই অন্তর্দ্বন্দ্ব থাকায় কংগ্রেস পিছিয়ে আসে। শূন্যস্থান পূরণ করতে এগিয়ে আসে মুসলিম লিগ। সেদিনই যেন বাংলাদেশের ভাগ্যলিখন সম্পন্ন হলো। তারপর ভাগ্যলিখন অনুসারে বাঙালি এগিয়ে গিয়েছে দেশভাগের দিকে, পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হবার দিকে, পড়শিতে পড়শিতে আলাদা হবার দিকে।

এই অস্থির কালপ্রবাহে লেখক উপন্যাসে চরিত্র হিসাবে এনেছেন মহাত্মা গান্ধি, সুভাষচন্দ্র বসু, মহম্মদ আলি জিন্না, জওহরলাল নেহেরু, শরৎ চন্দ্র বসু, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, জীবনানন্দ দাশ, দিলীপকুমার রায়, আব্বাসউদ্দিন, প্রমথেশ চন্দ্র বড়ুয়া, কাজী নজরুল ইসলাম, সজনীকান্ত দাশ, অদ্বৈত মল্লবর্মণ, কানন দেবী, মুজফ্ফর আহমেদ, ফজলুল হক, সোহরাওয়ার্দি, অহীন্দ্র চৌধুরী, হেমেন্দ্র কুমার রায়, বঙ্কিম ঘোষ, অতুল্য ঘোষ, প্রফুল্ল চন্দ্র সেন, নরেশ সেনগুপ্ত, মৌলানা আক্রম খাঁ, চারুচন্দ্র বিশ্বাস প্রমুখ। এই বিশাল ক্যানভাসে লেখক ঐতিহাসিক চরিত্র ও ঘটনার

সঙ্গে সঙ্গে পেশকার অনন্ত ঘোষালের কাহিনি তুলে ধরেছেন। মধ্যবয়স্ক অনন্ত খুলনা কোর্টের সেসন জজের পেশকার হিসাবে কাজ করে। পাঁচ সন্তান (টুনু, পানু, তনু, খোকন, গৌর) ও স্ত্রী রত্না ঘোষালকে নিয়ে সে অবিভক্ত বঙ্গের খুলনা শহরে মাসিক চোদ্দ টাকার ভাড়া বাড়িতে থাকে। টুনু কলেজে, পানু এবছর ম্যাট্রিকুলেশন দেবে, তনু ক্লাস থ্রিতে পড়ে। আর বছর চারেক বয়স খোকনের ও গৌর সবে এক বছর পেরিয়েছে। আয়ের দিক থেকে অনন্ত ঘোষাল নিম্নমধ্যবিত্ত যে বাড়িতে এখনও ইলেকট্রিক আলোর ব্যবস্থা করতে পারেনি। এছাড়াও আমরা উল্লেখযোগ্য কাল্পনিক চরিত্র হিসেবে পাই কংগ্রেস কর্মী ভবানীকে (সুভাষপন্থী) যার স্বামী দিলীপ সন্ন্যাসী হয়ে গেছে। এই ভবানীর সঙ্গে টুনুর একটা মিষ্টি প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। টুনু সংসারে আয় বাড়াতে কলকাতায় দাঁতের মাজন কোম্পানিতে কাজ নেয়। পানু বড় হয়ে কমিউনিস্ট পার্টিতে নাম লেখায়। তেভাগার দাবিকে সফল করতে আরও অনেকের সঙ্গে পানু গ্রামে গ্রামে ঘোরে। জমিদার ধীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, তার বাবা শিরীশবাবুর দুই জারজ সন্তান কালা আর ফোতো, ফ্যাকাশি দাই, জমিদার কালিদাস ঘোষ, মুসলিম লিগ সংগঠক ফেরদৌস প্রমুখ চরিত্র অনায়াসে জায়গা করে নেয় ঐতিহাসিক চরিত্রের সঙ্গে। এভাবেই বাঙালি হিন্দু ও বাঙালি মুসলমান— জমিদার, মধ্যবিত্ত, নিম্নমধ্যবিত্ত, জারজ সন্তান, অতিবৃদ্ধ, ভূমিহীন চাষি; সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষেরা উপন্যাসের কাহিনিতে তৎকালীন বঙ্গের চিত্র ফুটিয়ে তুলতে সাহায্য করেছে। আসলে 'আলো নেই' উপন্যাসটি অবিভক্ত বঙ্গের ত্রিশ-চল্লিশ দশকের প্রেক্ষাপটে তৎকালীন রাজনৈতিক-সামাজিক জীবনকে তুলে ধরেছে।

'ক্ষমতার বারান্দা' (১৯৮৮) উপন্যাসটি মধ্যবিত্ত পরিবারের অক্ষয় দত্তের পশুপালন, পূর্ত ও গৃহমন্ত্রী হয়ে শপথ নেওয়া দিয়ে শুরু হয়েছে। পাশাপাশি চলেছে অক্ষয় দত্তের কিছুটা স্মৃতিচারণ। সাধারণ জীবনকে খুব কাছের থেকে দেখা, পলিটিক্স-এ নিজের মাটি শক্ত করার গল্প এটি। তাইতো রাজনীতির যাঁতাকলে এই চরিত্রটি বারবার ক্লান্ত বোধ করে। তার কাছে এই 'মন্ত্রীত্ব' প্রমোশন বলে মনে হলেও স্ত্রী ইলা মনে করিয়ে দেয় এ বরং 'ডিমোশন'। কতগুলো চোখ সারাক্ষণ নজরে রাখে, সহানুভূতিও হয়ে দাঁড়ায় কটাক্ষের কারণ। হয়তো জীবনকে বিভিন্ন অনুভূতিতে দেখেছেন বলেই এমন দরদি কথা বলে চরিত্রটি। কোনও দিন বড়লোক হবে এই ভাবনায় চিন্তিত হয়নি অক্ষয়। সতেজ স্নায়ু, অল্পেই খুশি। একসময় যে গান্ধিবাদী সরলদার কাছে অসময়ে সাহায্য পেয়েছিলেন এবং ১৯৪৫ খ্রি. জেল থেকে বেরিয়ে যখন আর সরলদার খোঁজ পেলেন না তখন তার মনে হলো যেন প্রথম যৌবনের উপবন তছনছ হয়ে গেছে। আজ যখন সেই সরলদার ঘরেই যেতে হচ্ছে সিমেন্ট মামলার

আসামিদের জামিন পাওয়ার ব্যাপারে কথা বলতে তখন ভেতরে ভেতরে অনেকটা দুর্বল হয়ে গিয়েছিল। হর্ষ ঘোষ হলেও হয়ত এতটা হত না। কিন্তু যখনই তিনি ক্লান্ত হয়েছেন, যখনই মনে হয়েছে সব মিথ্যে তখনই তার নিজের ভেতরে পেয়েছেন 'ডগলাস'কে। ভেতর থেকে যে সাহস যুগিয়েছে তাকে। মন্ত্রী হবার পর নানাদিক থেকে তাকে গো স্লো বলা হলেও চুপ করে থাকেননি তিনি। নিজের কথাকে কাজে রূপায়িত করেছেন বরাবরই। শরৎ সেতুর মামলা যেন অক্ষয়কে নাড়িয়ে দেয়। দল থেকে বেরিয়ে নতুন করে রাজনীতির কথাও তাকে ভাবতে হয়। কিন্তু মন্ত্রীত্ব ছাড়াও সহজ কথা নয়। ক্ষমতার বারান্দা থেকে দেখলে অনেক সহজ দেখা জিনিসও জটিল হয়ে ওঠে। ক্ষমতায় থেকে ক্ষমতা প্রয়োগ না করার গ্লানি অক্ষয় অনুভব করে। মনে হয় যেন শুধু তিনি কথার খেলাপ করে চলেছেন। এক সময়ের আইন অমান্য, হরতাল, জোড়া বাংলা বন্ধ, ১৪৪ ধারা ভঙ্গ রাজবন্দী আজ রাজপ্রতিনিধি। ফিরে গেছেন প্রতিমার কাছে একটু স্বস্তির জন্য। ভালোবাসার জায়গাকে আঁকড়ে ধরে ক্ষমতায় এসে আজ সব মোহ কেটে গেছে। রাজনীতি ছেড়ে আবার নতুন করে বাঁচার ইচ্ছা— এটাই স্বাধীনতা। এই সার কথাটাই উপন্যাসের শেষে উঠে এসেছে।

'ডুব সাঁতারের বিপদ আপদ' (১৯৮৮) উপন্যাসটিকে একটি সামাজিক উপন্যাস বলা যেতে পারে। যেখানে একই সময়ের নানা চরিত্রের আনাগোনা। উপন্যাসটি মোহিতকুমার মুখোপাধ্যায় ও তার স্ত্রী ঊর্মির নতুন বাড়িতে উঠে আসা দিয়ে শুরু হয়েছে। নতুন ভাড়াবাড়ির আশেপাশের মানুষদের নিয়ে উপন্যাসটি। যেখানে দুর্গা মৌলিক মৃত স্বামী মৃগাঙ্কমোহন মৌলিকের স্বপ্ন দেখে বাস্তবতায় ভাসে। দুই সন্তানের মা পুটুকে দেখে মোহিত হয়ে যায়। আলু আর লেবু, দুই ভাইয়ের মধ্যে লেবুর পাড়ারই তার চেয়ে কম বয়সের কঙ্কাবতীর প্রেমে পড়া আর রঘুপতি ঘোষের রোগা হওয়ার অদম্য ইচ্ছা— এইসব রয়েছে গোটা উপন্যাস জুড়ে। গতানুগতিক অভ্যস্ত জীবন নিয়েই যেন মেতে থাকে মোহিত। আবার কখনও পুটকে দেখে নিজেকে ঘষেমেজে রোগা করার তাগিদ জাগে। এছাড়াও রয়েছে ঝকঝকে স্লিম তরুণী নন্দা। মোহিতের মনে হয় তার আর কোন আকাঙ্ক্ষা নেই কেননা সে আর অস্থির হয়ে ওঠে না। আকাঙ্ক্ষা মরে যাওয়া মানুষ সে।

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'কঠিন সময়' (১৯৯৯) উপন্যাসটি শুরু হচ্ছে প্রণবেশ দস্তিদারের ওজন যন্ত্রে নিজের ওজন মাপা নিয়ে। 'ডুব সাঁতারের বিপদ আপদ' উপন্যাসটিতেও যেমন দেখা যায় মানুষের রোগা হওয়ার তীব্র ইচ্ছা, এখানেও দেখা যায় পুরানো চেহারার প্রতি মোহ কিংবা বর্তমানের প্রতি অনীহা। মানুষ মোহের বশবর্তী হয়ে আশ্রয় নেয় অলৌকিকতার (প্রসঙ্গ বশীকরণ)। জানে না

ফল কী হবে, তারপরেও।

'তারসানাই' (১৯৯৩) উপন্যাসে দেখি ষাট বছরের এসরাজ শিল্পী সুধীর পালিতের নিঃসঙ্গতা। বত্রিশ বছরের বিবাহিত জীবনের শেষে এসে তিনি দেখেন, এসরাজ বাজাবার জন্যে একজন শিল্পীর ভেতর যে আনন্দ থাকা দরকার— তা আর নেই। আরতির সঙ্গে তার দাম্পত্য জীবন একটা অভ্যেসে পরিণত হয়েছে। এসরাজ বাজানো যখন বোঝা হয়ে উঠছিল সুধীর পালিতের কাছে তখন তার এক গুণমুগ্ধ ভক্ত সোহিনীর সঙ্গে তার পরিচয় হয় ধীরে ধীরে যা অসম বয়সের প্রেমে পরিণত হয়। যদিও এই প্রেম নিয়ে কোনও লুকোছাপা নেই সুধীরের। এই প্রেমই তার শিল্পীসত্তাকে পুষ্টি জোগায়। এমনকি সুধীর পালিত নিজের শরীর-স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠে। আরও বেশি অর্থের সংস্থান করতে ছোটে একদা স্কুলের বন্ধু বর্তমান শেয়ার-ব্রোকার দেবুর কাছে। সোহিনীর সঙ্গে সম্পর্ক হলেও আরতির প্রতি ভালোবাসা সুধীরের কম হয় না। আসলে সুধীর একই সঙ্গে দু'জনকেই ভালোবাসতে চায়। দু'জনকে নিয়ে সবার সঙ্গে একই বাড়িতে থাকতে চায়। এই ধরনের ভাবনা না আরতি না সোহিনী কেউই গ্রহণ করতে পারে না। তাই সোহিনী শেষপর্যন্ত পিছু হটে। একজন শিল্পীর শেষ বয়সেও শিল্পীসত্তাকে বাঁচিয়ে রাখার আপ্রাণ চেষ্টা এই উপন্যাসে আমরা দেখতে পাই। 'সুশ্রী, গৌরী এবং ...' (১৯৯৩) উপন্যাসে লেখক এমন এক সময়ের কথা বলেছেন যখন চাকরি নির্ভর বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণির মধ্যে প্রবল হতাশা বাসা বেঁধেছে। শিক্ষিত বেকার ছেলের সংখ্যা ক্রমবর্ধমান। ফলে বৃদ্ধি পেয়েছে বিয়ে না-হওয়া মেয়েদের পাড়াবেড়ানো স্বভাব। শতকরা নব্বই জনকে কাজ দিতে হবে— এই দাবি নিয়ে ভোটের ময়দানে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল লড়াই করে। কাগজে সুশ্রী, গৌরী, স্বাস্থ্যবতী ইত্যাদি দিয়ে পাত্রীর বিজ্ঞাপন বের হয় কিন্তু বিয়ে করার জন্য একটি পুরুষের যে আর্থিক নিরাপত্তার দরকার, তা না থাকার ফলে বিয়ে করতে সাহস পায় না সেই সময়ের অবিবাহিত যুবকেরা। অদিতি এরকমই এক বিবাহযোগ্যা সুন্দরী মেয়ে। তার প্রেমে পড়ে তারই দিদির ছেলে রানা। আবার ষাটোর্দ্ধ বিপত্নীক বিপন্ন পালক বসু পেনশনের টাকা সম্বল করে নিজের বেকার ছেলের বিবাহ প্রস্তাব দেবার বদলে নিজের বিবাহ প্রস্তাব রাখে অদিতির কাছে। অন্যদিকে অদিতি ভালোবাসার জন্য নিজের মনের মত যুবক না পেয়ে তার চেয়ে বয়সে অনেক বড় বিবাহিত তড়িৎবাবুর সঙ্গে সম্পর্কে জড়িয়ে যায়। তার একদা প্রেমিক পার্থ আর্থিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে না পেরে পার্থর আত্মবিশ্বাস তলানিতে গিয়ে ঠেকে। ফলে অদিতি রাজি থাকলেও সম্পর্ক থেকে পিছিয়ে আসে পার্থ। এজন্যই অদিতি শেষপর্যন্ত তড়িৎ-এর সঙ্গেই প্রেমের সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে। আসলে লেখক সেই সময়ের চাকরির অভাব,

অবিবাহিত মেয়েদের সমস্যা, শিক্ষিত বেকার যুবকদের সমস্যা ইত্যাদি কীভাবে আমাদের সামাজিক-পারিবারিক জীবনে সম্পর্কের রসায়ন পাল্টে দিচ্ছিল, তাই ফুটিয়ে তুলেছেন।

'তারসানাই' উপন্যাসে আমরা যে কাহিনি পাই—সেই একই রকম কাহিনি আর একটু পল্লবিত আকারে দেখতে পাই 'কামিনীকাঞ্চন' (১৯৯৪) উপন্যাসে। এসরাজ শিল্পী সুধীর পালিত এখানে লেখক কনক পালিত। স্ত্রী আরতি উভয় উপন্যাসে একই নামে রয়েছে— যেমন রয়েছে পালিত-প্রেমিকা সোহিনীর নাম। শেয়ার বাজার ইনভেস্টর দেবু এখানে হয়েছে ভরত চৌধুরী। দু'জায়গাতেই অফিসের নাম লায়নস রেঞ্জ। তবে এই উপন্যাসে ভরত চৌধুরীর জীবন ও পরিবারের কাহিনি একটি বড় জায়গা জুড়ে আছে। সোহিনী বুঝতে পারে শুধু ভালোবাসলেই বা দু'জনেরই নতুন জীবন শুরু করার ইচ্ছা থাকলেই তা করা যায় না। কারণ 'ভালোবাসায় টাকারও একটা জায়গা আছে। ভালোবাসা স্রেফ গাছতলায় হয় না। ... সে জানত না— ভালোবাসায় এক শর্ত থাকে। যে শর্ত তারকাঁটা হয়ে পিঠে ফুটে যায়। সব সময় যন্ত্রণার পাথর হয়ে মনের ভেতর ডেবে বসে থাকে।"[২৯] তাই শেষ বয়সে এসে কনক পালিতকে টাকা বাড়ানোর খেলায় নামতে হয়।

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় হিন্দু ধর্মের একটি অন্যতম বিশ্বাস জন্মান্তরবাদ, কর্মফলবাদ-কে বিষয় করে উপন্যাস নির্মাণ করেছেন। আমরা এই বিষয়কে কেন্দ্র করে লেখা দু'টি উপন্যাস পাই 'গত জন্মের রাস্তায়' (১৯৮৫) ও 'ভালবাসিব না আর' (১৯৯৮)। 'গতজন্মের রাস্তায়' উপন্যাসে বঙ্কুনাথ মহত্তমের একমাত্র ছেলে বিপুল তার গতজন্মের সব ঘটনা মনে করতে পারে। যেমন— সাঁতার না জানার ফলে পুকুরে ডুবে তার মৃত্যু হয়, বাবা-মা, তার দাদার র‍্যাকেট কোথায় লুকিয়ে রেখেছিল, কোথায় আগে থাকত ইত্যাদি। প্রথমে বিশ্বাস না হলেও গতজন্মের বাবা নীরদ, মা অনিমা, দাদা তনুর ধীরে ধীরে বিপুলের প্রতি গভীর বিশ্বাস ও টান জন্মাতে থাকে। সেই টানকে লক্ষ্য করেই এজন্মের বাবা-মা বঙ্কু ও নয়নতারার মধ্যে অর্থপ্রাপ্তির লোভ জন্মাতে থাকে। এই চরিত্রগুলো ছাড়াও আমরা গুণিন সত্য মহত্তম, স্ব-ঘোষিত অবতাররূপী শান্তি মহত্তম প্রমুখ চরিত্রদেরও দেখি। ধর্ম, ভগবান, অবতার, লোকবিশ্বাস ইত্যাদির সঙ্গে অর্থের একটা ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ আছে তা এই উপন্যাসে লেখক দেখিয়েছেন। জাতিস্মর হবার ঘটনা আমরা 'ভালবাসিব না আর' উপন্যাসেও দেখতে পাই। এখানে অঘোরিবাবা কলেজের অধ্যাপক কমলেশকে বলে, ''দেখুন—আমরা আলাদা আলাদা আত্মা হলেও জন্মসূত্রে একই জাতকের সঙ্গে আমাদের জন্ম-জন্মান্তরের সুতোর যোগ থাকে। কোনও রাস্তা দেখলে মনে হয়— বড় চেনা। কোনও অপরিচিত মানুষকে দেখলে মনে হয়— যেন চিনি। যেন চিনতাম। এমন হয় কেন? হয়—

কারণ, চাপা পড়া স্মৃতি যখন সংস্কার ভেদ করে জেগে ওঠে।"[৩০] এই বাবার পরামর্শেই কাজের ছেলে পটল ও স্ত্রী খুকুকে নিয়ে কমলেশ বেনারসের গোধূলিয়ায় যায়। সেখানে গিয়ে কমলেশ ও খুকুর গতজন্মের বিভিন্ন স্মৃতি ফিরে আসতে থাকে। কমলেশ সেই স্মৃতিতে পুরোপুরি ডুবে গেলেও পটল খুকুকে সেই স্মৃতিতে পুরোপুরি ডুবতে বাঁধা দেয়। আসলে দীর্ঘদিন কমলেশের বাড়িতে কাজ করতে করতে বালক পটলের খুকুর প্রতি ভালোলাগার টান জন্মেছে। পটলের মনে ভয় জন্মায় এই যে, খুকু যদি এই জন্মের স্মৃতিতে ফিরে না আসে, তাহলে হয়তো পটল দূরে সরে যাবে। তাই সর্বশক্তি দিয়ে বাঁধা দিতে থাকে মামিমা বলে সম্বোধন করা খুকুকে। এখানে বালক পটলের ভালোবাসা অন্যতম বিষয় হয়ে দাঁড়ায়।

'ভালোবাসলে জ্বর হয়' (১৯৮২) ও 'চিন্ময়ী' (১৯৯৬) উপন্যাসের কাহিনিসূত্র এক। একটি কাহিনিসূত্র দিয়েই পৃথক নামে গ্রন্থ প্রকাশ বলা যেতে পারে। সমাজ, সময় বদলালেও নারীরা যে পুরুষের চোখে ভোগ্যপণ্যের বেশি কিছু নয়, তা চিন্ময়ীর প্রতি মিহির, গোপাল প্রমুখের আচরণেই প্রমাণিত। সেই নারী যদি আবার আর্থিক ও মানসিক দিক থেকে অসহায় ও একাকী হয়। নিজের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য চিন্ময়ীকে সুযোগ তুলে ধরতে হয় লোভী শকুনের মত চেয়ে থাকা পুরুষদের সামনে। কিন্তু সময় বদলায়, দেওয়ালে পিঠ ঠেকে গেলে একদিন ঘুরে দাঁড়ায় চিন্ময়ী। বিয়ে হয় কল্যাণদের অফিসের বড় কর্তার সঙ্গে। এবার বিভিন্নভাবে তাদের উদ্দেশ্যে করুণা বিতরণ করে তাদের অসহায়তার সুযোগ নেয় এবং বুঝিয়ে দেয় সমাজে তাদের অবস্থান। 'কাপতেনগঞ্জের কুন্দনলাল' (১৯৮৫) ও 'শেষ দরবার' (১৯৮৮) উপন্যাসের কাহিনিও একসূত্রে গাঁথা। এখানে এক রাজনীতিবিদের জীবনকাহিনি ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। লেখকের অনেক উপন্যাসেই বেশি বয়স্ক পুরুষ মানুষের কম বয়স্ক বা কখনও মেয়ের বয়সী নারীর প্রতি প্রেমের সম্পর্ক দেখতে পাই। শিল্পী, সাহিত্যিক থেকে রাজনীতিবদ্, সাধারণ গৃহস্থ প্রায় সবক্ষেত্রের পুরুষ মানুষের মধ্যে এই প্রবণতা আমরা লক্ষ্য করি। এখানে রাজনীতিবিদ্ কুন্দনলালের বহুগামীতা লেখক তুলে ধরেছেন। রাজনৈতিক ক্ষমতা ও আর্থিক প্রতিপত্তি— দু'টো বিষয়ই তার বহুগামী প্রবণতাকে লাগাম পরাতে দেয়নি। দুই স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও নিজের এক স্ত্রী (বিমলা)-র বোনের মেয়ে শিপ্রাকে বিয়ে করে সে। নিজের অত্যন্ত প্রিয় বন্ধু অমিয়র একমাত্র মেয়ে মায়ার সঙ্গে সম্পর্কে জড়ায়। তার এই বহুগামী প্রবণতা ও রাজনীতিতে কুন্দনলাল এতটাই ডুবে যায় যে পরিবারের প্রতি ও পরিবারের অন্যান্য লোকজনের (ছেলে-মেয়ে) প্রতি কোনও নজরই থাকে না। কিন্তু যে রাজনীতি ছিল কুন্দনলালের অন্যতম অস্ত্র— যাকে হাতিয়ার করে সে

এতদিন কাপতেনগঞ্জে কাপ্তানি করে গেছেন; নিজের সেই অতিপরিচিত জায়গাতেই রাজনীতির জন্য নিজেরই ছেলে প্রবীরের হাতে খুন হতে হয়।

'দশ লক্ষ বছর আগে' (২০০১) উপন্যাসে লেখক ইতিহাসের স্মৃতি ও বিজ্ঞানের কল্পনার মেলবন্ধন ঘটিয়েছেন। টালিগঞ্জের সংহতি কলোনির বাসিন্দা রাখাল মাস্টারের স্মৃতি আটকে থাকে দু'শো বছর আগের হেস্টিংস-কর্ণওয়ালিশ-টিপু সুলতানের সময়ে। অন্যদিকে জলধর কুণ্ডুর একমাত্র ছেলে পরিতোষ ও তার স্ত্রী এলসা টিচবোন জেনেটিক্স টেকনোলজি নিয়ে গবেষণা করে। তারা প্রাণের কূট-রহস্যে ডুব দিয়ে এই পৃথিবীর প্রাণের অনুরূপ প্রাণ তৈরির নেশায় বুঁদ হয়ে থাকে। বর্তমানে আমরা যা 'ক্লোন টেকনোলজি' নামে জানি, লেখক হয়তো সেদিকেই ইঙ্গিত দিয়েছেন। ফলে বলা যেতেই পারে, উপন্যাসে 'ক্লোন টেকনোলজি'র প্রসঙ্গও আমরা পাই। আবার জলধর কুণ্ডু পৈত্রিক সম্পত্তি নিয়ে দাদার সঙ্গে মামলায় জড়িয়ে পড়েছিল। সেই মামলাতেই দাদা নিঃস্ব হয়ে শেষপর্যন্ত মারা যায়— মৃত্যুর আগের তিন বছর পরস্পর একটি কথাও বলেনি। সেখান থেকেই এক গভীর পাপবোধের জন্ম হয় জলধরের মনে। এই পাপবোধ থেকেই স্মৃতিভ্রংশ রোগে আক্রান্ত হয়ে সব ভুলে যায় সে। সংহতি কলোনির কুণ্ডুদের বাড়িতে ক'দিনের জন্য থাকতে এসে জলধরের পুত্রবধূ এলসা এক গভীর রাতে ঘুম থেকে উঠে খটখটে পুকুরের গর্ত থেকে কোনও প্রাগৈতিহাসিক জন্তুকে দেখতে পায় যাকে রাখাল মাস্টার নাম দিয়েছে কচিবাঘ বা বাঘডাঁশা। আসলে প্রকৃতি-পরিবেশ তার নিজস্ব খেয়ালে চলে— বিজ্ঞান সেটা নিয়েই কাঁটাছেঁড়া করে গালভরা নাম দেয় — জেনেটিক্স ইঞ্জিনিয়ার। এই পৃথিবী সব সময় নতুন নতুন প্রাণের জন্য অপেক্ষা করে থাকে। তাই যখন এলসা তার পেটের ভ্রূণকে ব্যবহার করতে চায় শ্বশুরমশাইয়ের স্মৃতি ফিরিয়ে আনতে তখন শাশুড়ি আরতি প্রবল বাধা দেয়। কারণ আরতির কাছে কৃত্রিম জীবন অপেক্ষা প্রকৃতি প্রদত্ত জীবন অনেক বেশি মূল্যবান।

'নয়ন' (১৯৯৮) উপন্যাসের প্রধান চরিত্রে আছে সাতানব্বই বছরের কৃপাসিন্ধু তালমিছরি কোম্পানির মালিক শিল্পপতি নয়নসিন্ধু রায়। বাবা কৃপাসিন্ধু যে প্রতিষ্ঠানের বীজ বুনে গিয়েছিলেন— তাই নয়নসিন্ধু অসম্ভব পরিশ্রম, অধ্যবসায়ের মাধ্যমে দেশের অন্যতম একটি তালমিছিরির কোম্পানিতে পরিণত করে। এতগুলো বয়স পার করে এসেও নিজের হাতে তৈরি কোম্পানির প্রতি নয়নসিন্ধুর টান অটুট আছে। যদিও ব্যবসার সমস্ত দিক বর্তমানে দেখে একমাত্র ছেলে কুসুমসিন্ধু। কিন্তু ব্যবসা বাড়াতে গেলে বা ধরে রাখতে গেলে যে মনোযোগ, নিষ্ঠা থাকা দরকার, তার ছিটেফোঁটা নিজের ছেলের মধ্যে দেখতে পায় না। অফিসে কাজের সময় নিজের সেক্রেটারিকে নিয়ে দাবা খেলতে

বসে কুসুম। ব্যবসা বাড়ানো অপেক্ষা আধুনিকীকরণে তার মনোযোগ বেশি। ফলে বিভিন্ন ডিস্ট্রিবিউটরদের কাছে পাওনা বৃদ্ধি পাওয়া, অফিসে ঘুঘুর বাসা বাঁধা, শ্রমিক অসন্তোষ ইত্যাদি ঘটনা ঘটতে থাকে। কোম্পানিতে প্রেসিডেন্ট পদে থাকলেও নয়নসিন্ধুর নিয়ন্ত্রণ আলগা হতে থাকে। তার ইচ্ছা-অনিচ্ছা খুব বেশি গুরুত্ব পায় না কোম্পানিতে কিংবা কুসুমসিন্ধুর কাছে। নয়নসিন্ধু শেষ বয়সে এসে বুঝতে পারে, ''... আমি আর তোমার বাবাও নই— দাদাও নই। আমরা দুজন আলাদা মানুষ। সংসার করতে গিয়ে আমি তোমার বাবা। তুমি আমার ছেলে।''[৩১] তাই হয়তো তিলে তিলে তৈরি করা সিন্ধু গার্ডেন ছেড়ে যায় না নয়ন। এই বাড়িতে জড়িয়ে আছে তার স্ত্রী সত্যবতীর স্মৃতি। রয়েছে নিজের হাতে তৈরি করা দুষ্প্রাপ্য বইয়ের গ্রন্থাগার। আর গ্রন্থাগারের পেছনে পুরানো অচল নোট রাখার ঘর। যে টাকার হিসাব কৃপাসিন্ধু মিছরির খোলা খাতায় দেখানে অসম্ভব। এইসব টাকা শুধু নয়নসিন্ধুর বুদ্ধিবলে আয় করা। ফলে সে বাতিল টাকার মধ্যেই নিজের অক্লান্ত পরিশ্রম, অধ্যবসায়ের দিনগুলো দেখতে পায়। যে ছেলে তাকে বর্তমান ব্যবসার সময়ে বাতিল মনে করে, সেই ছেলের তৈরি বাড়িতে না গিয়ে এই বাতিল সিন্ধু গার্ডেনের বাতিল নোটের মধ্যে থেকে যেতে চান তিনি। যেখানে প্রতিটি ছত্রে ছত্রে নিজের সৃজনশীল হাতের ছোঁয়া, এক পরিশ্রমী হাতের ছোঁয়া লেগে আছে— বয়সের ভারে সেই হাত যতই কাঁপুক না কেন!

প্রকাশক চরিত্রও উঠে এসেছে লেখকের কলমে। 'তৃতীয় মেরু' (১৯৯৮) উপন্যাসে শ্রীকুমার চট্টোপাধ্যায় বেদান্ততীর্থ সংস্কৃতজ্ঞ মার্জিত রুচির একজন প্রকাশক যিনি নিজের পরিশ্রম দিয়ে নয়নসিন্ধুর মতই ধরণী আর্ট প্রেসের পত্তন ও সমৃদ্ধি ঘটান। শুধু পার্থক্য এখানেই যে শ্রীকুমারবাবু গুণগতভাবে উন্নত মানের বই প্রকাশকে আঁকড়ে ধরে থাকেনি। তার সঙ্গে সমান্তরালভাবে চালিয়েছে পর্নোগ্রাফির বই প্রকাশের ব্যবসা। আর এসব অশ্লীল বই লেখার কাজে যুক্ত হত তারা যারা বুকভরা স্বপ্ন ও নিঃস্ব পকেটে শুধু পান্ডুলিপি হাতে নিয়ে প্রকাশকের দরজায় দরজায় হন্যে হয়ে ঘুরত— তাদের অসহায়তার সুযোগ নিতেন শ্রীকুমার। একসময় উদীয়মান লেখক অনিমেষ মিত্র বেদান্তের এই ধরনের ষড়যন্ত্রের শিকার হয়। এমনকি পুলিশের হাতে অনিমেষ ধরাও পড়ে। এরপরেই জীবন পাল্টে যায় অনিমেষের। এসবই অবশ্য অনেকদিন আগে ঘটে যাওয়া ঘটনা। বর্তমানে অনিমেষ নাম পাল্টে টগর মিত্র নামে বিখ্যাত লেখক। ভাড়াটে হয়ে নতুন পাড়ায় উঠে আসলে সেখানে আলাপ হয় সরল বড়াল ও তার অন্ধ শ্বশুরের সঙ্গে। এক ধাক্কায় অনেক দিনের পুরানো ক্ষত যেন জেগে উঠল অনিমেষের হৃদয়ে। কারণ সরল বড়ালের অন্ধ শ্বশুরই হলেন একদা দাপুটে প্রকাশক বেদান্ততীর্থ। একদিন ভোরবেলায়

অশক্ত অসমর্থিত বেদান্ততীর্থের দেখা পেলে অনিমেষ তার সমস্ত ক্ষোভ উগরে দেয়। এমনকি হত্যার পরিকল্পনাও তার মাথায় আসে কিন্তু শেষপর্যন্ত যে দেবতুল্য ইমেজ নিয়ে পরিবারে-সমাজে বাস করছে বেদান্ততীর্থ— অতীতের সমস্ত ঘটনা ফাঁস করে সেই ইমেজটাকেই নষ্ট করে দিতে চায় অনিমেষ। কারণ অতীতে পুলিশের হাতে ধরা পড়ে তার সবচেয়ে বড় ক্ষতি হয়েছিল তার সম্মানের। অনিমেষ বলে, ''কেউ আজ তা মনে করে বসে নেই ঠিকই কিন্তু সব ভুলে গেলেও সেই লজ্জা ভুলতে পারি না শুধু তোমার জন্যে, শুধু তোমার জন্যে— শীতকালের ব্যথার মত টনটন করে ওঠে। আমি ভুলতে পারি না।''[৩২] অন্যদিকে শ্রীকুমার নিজের বয়স, অসহায়তার কথা বলে একদা দাপুটে প্রকাশক করুণা ভিক্ষা করতে থাকে অনিমেষ ওরফে টগর মিত্রের কাছে।

' সূর্যাস্তের আগে' (১৯৯৮) উপন্যাসটি অবসরপ্রাপ্ত কয়েকজন মানুষের কাহিনি। এদের মধ্যে কেউ পুনরায় কাজে যোগ দিয়ে কাজে ডুবে থাকে, কেউ প্রেমের সম্পর্ক নিয়ে এখনও আলোড়িত হয় আবার কেউ বা স্ট্যাটাস সিম্বলের ইগো অবসর জীবনেও বয়ে বেড়ায়। এই উপন্যাসের সুরথ ভাদুড়ির কাহিনি ও 'কহেলগাঁও' উপন্যাসের স্বরূপ তালুকদারের কাহিনি এক। দু'জনেই এনিমি প্রপার্টি এক্সচেঞ্জের মাধ্যমে এদেশে নবাব নির্মিত প্যালেসের মালিক হন। আবার দু'জনকেই সম্পত্তির পুরো দখল নিতে গিয়ে চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে হয়েছিল, যেটার মীমাংসা হয় আদালতে। শুধু 'কহেলগাঁও' উপন্যাসে যে রোশেনারার উল্লেখ সংক্ষিপ্ত আকারে করা হয়েছিল, এই উপন্যাসের শেষ অংশে সেই রোশেনারার সঙ্গে নীলাম্বরের কথোপকথনে তার উজ্জ্বল উপস্থিতি দেখা যায়। 'মানুষের রহস্য' (১৯৮৯) উপন্যাসে শ্রমিকশ্রেণির কথা উঠে এসেছে। এই শ্রমিকেরা নিজেদের মধ্যেই বিবাদমান। সংকীর্ণ স্থানীয় রাজনীতি ও মালিকপক্ষের কূটনীতিতে শ্রমিকশ্রেণির মধ্যে ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর জন্ম হয়। বিভাজনের রাজনীতি মানব সভ্যতার ইতিহাসে অনেক পুরানো একটি বিষয়। সেই বিষয়কে কেন্দ্র করেই লেখা এই উপন্যাস। যাদের উপরে এটা প্রয়োগ করা হয়, তারা বুঝতেই পারে না বৃহত্তর ক্ষেত্রে এটা নিজেদেরই ক্ষতি। এখানেও দেখি, একদল শ্রমিক ভিক্ষা করে অনাহারে দিন কাটায় আর অন্যদল কারখানার সামনে বসে তাস খেলতে খেলতে একদা সহকর্মীদের নিশ্চিহ্ন করার ষড়যন্ত্র পাকায়।

'জলপাত্র' (১৯৭৮) উপন্যাসে দেখি, অন্যকে জলপাত্র করে রাখার প্রবণতা — এই বিষয়কে কেন্দ্র করে এই উপন্যাস লেখা। সময়, সুযোগ, পরিস্থিতি, সাধ্য— এগুলো এই প্রবণতা বা প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণ করে। ঋষিরাজ পুরকায়স্থের পরিবারের মধ্য দিয়ে এই প্রবৃত্তির রূপ ও পরিণাম দেখিয়েছেন লেখক। একটা সচ্ছল সুখী পরিবার ঋষিরাজের । দীর্ঘ সুখী বিবাহিত জীবন কাটানোর পরেও পরিচারিকা

কুন্তি মান্নার প্ররোচনায় ও কিছুটা নিজের ইচ্ছাতেও বাবু হয়ে রক্ষিতা রাখার ইচ্ছা জন্মে। অন্যদিকে পুরকায়স্থের স্ত্রী মালাও নিজের শরীরী আবেদনের সাহায্যে তরুণ থেকে প্রৌঢ় সকলকে নিজের জলপাত্র করে রাখতে চায়। হয়তো দাম্পত্য জীবনের একঘেয়ামি থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা থেকেই তাদের মনের মধ্যে এই সাধ জন্মে। এখানে বাড়ির পোষা কুকুর খুশির মধ্যেও অন্য পুরুষ কুকুরের প্রতি টান দেখানো হয়েছে। আসলে পুরকায়স্থের পরিবারের প্রতিটি সদস্য কারও না কারও প্রতি আসক্ত। প্রত্যেকের মধ্যে অন্যকে জলপাত্র করে রাখবার ইচ্ছা। এটাই উপন্যাসের মূল বিষয়।

'গোলকধাম' (১৯৭৯) উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্রে আছে 'দৈনিক প্রভাত' পত্রিকার নিউজ এডিটর বছর চুয়াল্লিশের রঙ্গলাল সেন। নিউজপ্রিন্টের গোডাউনের ক্লাক থেকে ধীরে ধীরে পরিশ্রম, অভিজ্ঞতা ও কলমের জোরে আজ সে নিউজ এডিটর। কিন্তু রঙ্গলাল যখন দায়িত্ব নেয় তার আগে থেকেই 'দৈনিক প্রভাত'কে জনগণ সকাল বেলার সঙ্গী হিসেবে প্রত্যাখ্যান করা শুরু করেছিল। কারণ হিসেবে উঠে আসে শাসকদলের হয়ে অতিরিক্ত চাপলুসি, রাজনৈতিক এজেন্ডা ও চরিত্র দিয়ে কাগজের পাতা ভরানো এবং সেই শাসকদলের ভোটে হেরে যাওয়া ইত্যাদি। রঙ্গলাল সেন 'দৈনিক প্রভাতে'র এই পড়ন্ত বেলায় চলে যাওয়া নিউজ এডিটরের চেয়ারে বসে কীভাবে পুনরায় এই খবরের কাগজকে মানুষের সকালবেলার সঙ্গী করে তুলল— তারই কাহিনি হলো 'গোলকধাম' উপন্যাসের। এখানেও 'খুশি' নামের কুকুর দেখতে পাই। নিম্নবিত্ত সাধারণ মানুষ কী ধরনের খবর পড়তে চায়, কোন্ কোন্ বিষয়ে জানতে চায়, কোন্ কোন্ বিষয়ে তারা স্বাদ পায় বাড়ির মহিলা থেকে ওয়ার্কিং লেডি ইত্যাদি জানার জন্য রঙ্গলাল নিজে বেড়িয়ে পড়ে কলকাতার রাস্তায়— তারপর সারাদিন ধরে চলে পর্যবেক্ষণ। এই সব কাজ করতে গিয়ে সমাজবিরোধী কাজও তার নজরে চলে আসে। ফলে তাদের হাতে পড়ে মাথায়, হাতে রডের মার খেয়ে সে হাসপাতালে ভর্তি হয়। খবর পেয়ে রঙ্গলালের স্ত্রী রুবি হাসপাতালে গিয়ে দেখে খবরের কাগজের এম. ডি. স্বয়ং রঙ্গলালের ঘরের দরজার সামনে বসে আছে। কারণ সে জানে রঙ্গলালকে এখন কতটা দরকার 'দৈনিক প্রভাত'-এর।

'সওদাগর' (১৯৮১) উপন্যাসে লেখক নন-ব্যাঙ্কিং ফাইনান্সিয়াল প্রতিষ্ঠান কীভাবে দিনের পর দিন সাধারণ মানুষকে সর্বস্বান্তের অতল খাতে নিয়ে যাচ্ছে— এই বিষয়টিকে তুলে ধরেছেন। রবীন্দ্রনাথ দত্ত এক বড় রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের চেয়ারম্যান হিসেবে দেখা করে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে। সেখানেই উঠে আসে বেসরকারি আর্থিক প্রতিষ্ঠানের হাতে সরকারি আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ক্রমাগত মার খাওয়া, সরকারি ব্যাঙ্কের প্রতি সাধারণ মানুষের বিশ্বাস কমে যাওয়া, অনাদায়ী ঋণের বোঝায় সরকারি ব্যাঙ্কের

ক্রমশ ধুঁকতে থাকা ইত্যাদি। ব্যাঙ্কের রাষ্ট্রায়ত্তকরণ হওয়ার পরেও সাধারণ মানুষ কেন ঝুঁকছে না, তার কারণ খুঁজতে রবি দত্ত রঙ্গলাল সেনের মতো মানুষকে রাস্তায় নামায়। রঙ্গলাল মিশতে থাকে বিভিন্ন ধরনের মানুষদের সঙ্গে। সেখানে সে দেখতে পায়, বাজার অতিরিক্ত তিনগুণ বেশি সুদ দেওয়া, শক্তিশালী ডেডিকেটেড এজেন্ট নেটওয়ার্ক, দ্রুত লোন দেওয়ার পদ্ধতি ইত্যাদি। কিন্তু তারপরেও রবি দত্ত বুঝতে পারে না এত অতিরিক্ত সুদ কোম্পানি দেয় কীভাবে? কোন ধরনের ব্যবসা বা বিনিয়োগ আছে যাতে লাভ করে এত সুদ দেওয়া যায়? অনুসন্ধানে নেমে সে খোঁজ পায় 'লক্ষ্মীর ঝাঁপি' নামক একটি চিটফান্ড কোম্পানি থেকে বিতাড়িত কর্মী শচীনের। তার সঙ্গে আলাপচারিতায় রবি দত্ত জানতে পারে, রেট থেকে অতিরিক্ত তিনগুণ বেশি সুদ দেওয়া চিটফান্ডগুলো চলেছে সাধারণ মানুষের অন্তহীন লোভকে আশ্রয় করে। শচীন বলে, ''ধরুন— আপনি পাঁচ হাজার টাকা জমা রেখে পর পর দশ মাস সুদ পেলেন। তখন আপনিই সুদের স্বাদ পেয়ে ঘটি বাটি বেচে আরও টাকা এনে জমা দিলেন— আরও সুদ পাবেন বলে। লোভের তো শেষ নেই মানুষের। এই জিনিসটি ভবেনদা ভালো করেই জানেন। এইটেই লক্ষ্মীর ঝাঁপির ব্যবসার আসল কথা।''[৩৩] একজনের মুখে শুনে অন্যরাও এসে টাকা রাখবে। বারবার রাখবে। আসলে মানুষের জন্মসংখ্যা কোনও দিনই কমছে না। ফলে এই বিরাট ভারতবর্ষে নতুন মানুষ থাকছেই সর্বদা, যারা অন্তহীন লোভের বশবর্তী হয়ে ছুটে আসছে এই ধরনের কোম্পানিতে টাকা রাখতে। এরপর একদিন 'লক্ষ্মীর ঝাঁপি' কোম্পানির মালিক ভবেন বোসের ঘনিষ্ঠ হবার চেষ্টা করে রবি দত্ত। কিন্তু চতুর ভবেন বোস তা বুঝতে পেরে রবি দত্তকে আটক করে 'লক্ষ্মীর ঝাঁপি' অফিসের সেফ ভল্টে। কারণ নিজের স্বার্থসিদ্ধি করার জন্য বা ব্যবসার রহস্য যাতে ফাঁস না হয়, তারজন্য মানুষ খুন করা হয়তো ভবেন বোসের কাছে সামান্য ব্যাপার। 'শেষ বিকেলের আলো' (১৯৯৯) উপন্যাসে একজন নারীর লড়াইয়ের কথা উঠে এসেছে। বেশি মাইনের চাকুরে সুশান্ত বছর তিনেকের বাবলু ও স্ত্রী রূপাকে রেখে ব্রেন টিউমারে মারা যায়। তখন কাছের মানুষ হিসেবে পাশে থাকে বড়দা নিমাইচাঁদ ও দেবর সনৎ। কিন্তু কারও ওপর বোঝা হতে না চেয়ে রূপা নিজেই অর্থ সংস্থানের কাজে উদ্যোগী হয়। ডাকঘরের ন্যাশনাল সেভিংস সার্টিফিকেট বিক্রি করার কাজ হাতে নেয় সে— এ যেন একেবারে এক নতুন জীবন শুরু করা। অন্যদিকে এই রূপাকে সন্তানসহ গ্রহণ করতে রাজি হয় তারই দেবর সনৎ। দাদার বর্তমানে বৌদির প্রতি গোপন টান জন্মেছিল যা দাদার অবর্তমানে বৌদির সামনে প্রকাশ করে সে। এই সম্পর্কে রূপার বড়দা নিমাই চাঁদেরও তেমন কোনও আপত্তি থাকে না। কারণ সনৎ ভালো চাকরি করে, যত্নশীল, কম বয়স এবং সে রূপাকে আগাগোড়া

ভালোভাবে চেনে। কিন্তু রূপা এখানে গুরুত্ব দেয় সবচেয়ে বেশি মাতৃত্বকেই। তাই সে সনৎকে বিয়ে করতে রাজি, যদি তাকে আর কোনও দিন মা হতে না হয়। একজন নারীর আত্মসম্মান নিয়ে বেঁচে থাকার জন্য সংগ্রাম ও মাতৃত্ব, এই উপন্যাসের মূল বিষয়।

'তারসানাই', 'কামিনীকাঞ্চন' উপন্যাসে যে কাহিনিসূত্র পেয়েছি 'বাম অলিন্দ' (১৯৯০) উপন্যাসের কাহিনিসূত্রে সেটাই লক্ষ্য করি। এসরাজ শিল্পী বা সাহিত্যিকদের বদলে এখানে দেখি স্থপতি শিল্পী রঘুনাথ সেনকে। তার অন্যতম একজন গুণগ্রাহীর নাম বছর বাইশের জয়শ্রী বোস যিনি বর্তমানে কোম্পানি সেক্রেটারিশিপ পড়ছে। বছর পঞ্চান্নোর রঘুনাথ জয়শ্রীকে বন্ধুত্বের প্রস্তাব দিয়ে বলে, ''তোমার চিঠিখানা পেয়ে আমার ঝিমুনি কেটে গেল। আমি ঝিমিয়ে পড়েছিলাম। একটি মেয়ে আমার তৈরি নানান বাড়ির স্থাপত্য দেখে আমায় চিঠি লিখছে— এটাই আমার কাছে জেগে ওঠার পক্ষে একটা থ্রিল।''[৩৪] কিন্তু কলকাতা ধীরে ধীরে কংক্রিটের জঙ্গলে পরিণত হচ্ছে। উপরের মুক্ত আকাশ, ধুলোহীন আলোটুকুতে ভাগ বসাচ্ছে সামান্য কয়েকজন ভাগ্যবান। আর সাধারণ মানুষ তলায় বসে অন্ধকারে ধুঁকছে। এসবের বিরুদ্ধে আন্দোলনে নেমেছে জয়শ্রীর বাবা নিরঞ্জন বোস। এই দুইজন প্রিয় মানুষের তার্কিক আলোচনায় জয়শ্রী বাম অলিন্দ বরাবর রক্ত গলির ভেতর একটা চিনচিন ব্যথা অনুভব করে। কলকাতা শহরে একসঙ্গে থাকা যাচ্ছে না জন্য গোবিন্দপুর গ্রামে ছোট মাসির বাড়িতে ওঠে জয়শ্রী রঘুকে সঙ্গে নিয়ে। ছোট মাসির বাড়ির জায়গা ও অবস্থা দেখে সেখানেও রঘুনাথ তার স্থাপত্য বুদ্ধি দিয়ে হলিডে বাংলো তৈরি করে। কিন্তু ভবা ও বিজনের বিশ্বাসঘাতকতায় সেই কাজে ছেদ পরে। শেষপর্যন্ত রঘুনাথ বুঝতে পারে, সে ছবির মত কমপ্লেক্স তৈরি করতে পারে। কিন্তু সমগ্র পৃথিবীকে ছবির মত তৈরি করা তার পক্ষে সম্ভব নয়। রঘুনাথের এই উপলব্ধি উপন্যাস-পাঠ শেষ করার পরেও পাঠকের মনে অনুরণিত হতে থাকে। 'অদৃশ্য ভূমিকম্প' (১৯৯৪) উপন্যাসে ইস্টার্ন ইন্ডিয়া এডভার্টাইজিংয়ের অফিসার বছর আটান্নোর সন্দীপ লাহিড়ীর গুণমুগ্ধ ভক্ত মেয়ের বয়সি রজনী দুই বছর একসঙ্গে কাটিয়ে এক তরুণ (প্রায় সমবয়সী) ছেলের সঙ্গে বিয়ে করে নতুন জীবন শুরু করতে চায়। রজনীর এই আকাঙ্ক্ষা গত দুই বছর ধরে সন্দীপের বুকের ভেতর যে বাড়িগুলো একটু একটু করে গড়ে উঠেছিল, যেমন—আত্মবিশ্বাস ভবন, ভালোবাসার কুটির, মমতা নিবাস, স্নেহ আলয়, রূপমুগ্ধ কুঞ্জ ইত্যাদি যেন অদৃশ্য ভূমিকম্পে হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ে। তারপরেও রজনীর ইচ্ছামত সন্দীপ নিজেরই বন্ধু বংশীর ছেলে অশোকের সঙ্গে বিয়ে দিতে উদ্যোগী হয় । কিন্তু অশোকের বাবা-মা রজনীর সঙ্গে বিয়ে নিয়ে আগ্রহ দেখালেও রজনীর পক্ষ থেকে প্রথম দিকে তেমন সাড়া না

আসায় তারা ছেলের বিয়ে অন্য জায়গায় ঠিক করে ফেলে। ফলে এখন সন্দীপের কথায় পিছিয়ে আসা সম্ভব নয়। ফলে সন্দীপকে ছদ্মবেশ ধারণ করে অনাথবন্ধু নাম নিয়ে অশোকের বিয়ে ভাঙার খেলায় নামতে হয় শুধু রজনীর জন্য। কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও সন্দীপ বিয়ে ভাঙতে সফল হয় না— ছদ্মবেশেও ধরা পড়ে যায় অশোকের কাছে। তখন রজনীর হয়ে কাকুতি-মিনতি শুরু করে সন্দীপ কিন্তু অশোক নিজের বিয়ের সিদ্ধান্তে অনড় থাকে এবং তাদের বিয়ে ভাঙার চেষ্টা থেকে সরে যেতে বলে। সন্দীপ লাহিড়ী যেন পুনরায় অদৃশ্য ভূমিকম্পে বিধ্বস্ত হয়।

অভয়ডাঙার পুলিশ থানার দোর্দণ্ডপ্রতাপ ও.সি. যতীন মিত্র দারোগাকে কেন্দ্র করে লেখক লিখেছেন 'যতীন দারোগার বেদান্ত' (১৯৯৩) উপন্যাসটি। যদিও উপন্যাসের কাহিনিতে সাংবাদিক নেপালের যথেষ্ট প্রাধান্য রয়েছে। বলা যেতে পারে নেপাল আঢ্যি এখানে মুখ্য চরিত্রের ভূমিকা পালন করেছে। যে নেপালকে যতীন দারোগা ছোট-খাটো খবর সংগ্রহ করতে সাহায্য করেছে— বিভিন্ন সার্কাস পার্টির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছে, সেই নেপালই অভয়ডাঙ্গা থানার গত এক বছরে তিরাশিটা অমিমাংসিত খুনের ঘটনা নিয়ে রিপোর্ট তৈরি করেছে। এরফলে একদিকে পুলিশ অন্যদিকে সমাজবিরোধী উভয় পক্ষকেই খেপিয়ে তুলেছে নেপাল। অন্যদিকে যতীন দারোগা এলাকার কুখ্যাত মাস্তান ভানুর তুলে নিয়ে গিয়ে বিয়ে করা মালতির সঙ্গে সম্পর্কে জড়িয়ে যায়। মালতিও ভানুর দেওয়া অনিশ্চিত জীবন থেকে বেরোবার পথ খুঁজছিল— তাই যতীন দারোগার মত নিশ্চিত নিরাপদ আশ্রয় আর কোথায় হতে পারে একজন মস্তানের জীবন থেকে বেরিয়ে আসতে চাওয়া স্ত্রী-র কাছে। তবে উপন্যাসে নেপালের এক নির্ভীক প্রতিষ্ঠিত সাংবাদিক হবার যে প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা— সেটাই যেন লেখক তুলে ধরতে চেয়েছেন। নিজের জীবনের কোনও পরোয়া না করে, দিনরাত অক্লান্ত পরিশ্রম করে সে রিপোর্ট তৈরি করে— যে বিষয়গুলো নিয়ে বেতনভুক স্থায়ী সাংবাদিকরাও খবর করতে ভয় পায়। কিন্তু কোনও খবরের কাগজ থেকে সেরকম কোনও সাড়া পায় না বরং তার অনেক শুভাকাঙ্ক্ষী তাকে সাংবাদিকতা ছেড়ে অন্য চাকরির খোঁজ করতে বলে বা ছোট পুঁজি নিয়ে ব্যবসা করার পরামর্শ দেয়। ইচ্ছা না থাকায় কোনোটাতেই নেপাল কিছু করতে পারে না। অগত্যা তাকে লিখতে হয়— লেখা ছাপানোর জন্য চাতকের মত চেয়ে থাকতে হয়। তাতে যা আয় হয় সেটাতে সংসার চলে না। তাই স্ত্রী ইলাকে অন্যের বাড়িতে কাজ করতে যেতে হয়। এভাবে চলতে চলতে তাদের বছর তিনেকের ছেলের হার্টে ফুটো ধরা পড়ে। সরকারি হাসপাতালে মির‍্যাকেলের আশায় পরীক্ষামূলক অপারেশনে সম্মতি জানায় নেপাল। কিন্তু বাস্তব বড় কঠিন, ছেলের মৃত্যু হয়। নেপালের

এই টানাটানি সংসারে থাকার জন্য স্ত্রী ইলার যেটুকু টান অবশিষ্ট ছিল, সেটাও শেষ হয়ে গেলে অন্য একজন পুরুষের নিরাপদ নিশ্চিত আশ্রয়ে ঠাঁই নেয় ইলা। প্রচন্ড হতাশ হয়েই নেপাল আঢ্যি নিজেকেই বলে, ''তুমি ভাই সাংবাদিক নয়। একজন পুত্রহীন সার্কাস সাঙ্গাবাদিক। যাদের বলে কয়ে ছবি, রিপোর্ট ছাপতে হয়— ভাল রিপোর্ট এনেও শেষ অব্দি যা মেঝেতে গড়াগড়ি যায়— তার লেখককে সাংবাদিক বলে না। বলে সাঙ্গাবাদিক। বাংলা ডিক্সনারিতে এই নতুন শব্দটা যোগ হওয়া দরকার।''[৩৫] নেপাল কবিতা, গল্প লেখে কিন্তু কোথাও কোনোখানে সে সেভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। স্ত্রী ইলা তাকে বলে যে, তার মত লোকের কাছ থেকে ডিভোর্স নেবারও দরকার পড়ে না। ইলা না থাকায় বাড়ি ফেরার আর কোনও টান অনুভব করে না নেপাল। তাই সারাদিন কলকাতায় ঘোরে এবং খাওয়া দাওয়া বিষয়ে সহজ সমাধান করে ফেলেছে সে, মল্লিক বাড়ির ট্রাস্টের খাতায় নাম তুলে, যারা একশো বছরের ওপর দু'বেলা নিরামিষ কাঙালি ভোজন করায় যেখানে আফ্রিকার একটা বনমানুষও তাদের সঙ্গে খায়। শেষে অবশ্য সার্কাসে বামন ক্লাউনদের নিয়ে লেখা পড়ে নিউজ এডিটর দিগিনবাবু নেপালকে খবরের কাগজে মোটা অঙ্কের টাকার কাজের অফার দেয়। কিন্তু নিঙরাতে নিঙরাতে নেপাল আঢ্যির সাংবাদিক হবার সব উৎসাহ, উদ্যম, ইচ্ছাশক্তি মৃত্যুপথযাত্রী। তাই উপন্যাসটিকে এক তরুণ সাংবাদিকের লড়াইয়ের কাহিনি বলা যায়।

নেপালের কাহিনির সঙ্গে সমান্তরালভাবে চলেছে দারোগা যতীনবাবু— মাস্তান ভানু— মালতীর কাহিনি। যদিও এখানেও কিছুটা অংশ জুড়ে আছে নেপাল নিজেই। এই চারজন পুরুষের সঙ্গে ভালোলাগার সম্পর্কে জুড়ে রয়েছে মালতি যদিও বর্তমানে সে দারোগার করায়ত্ত। মালতীকে একেবারে নিজের করে পাবার প্রধান প্রতিবন্ধক মাস্তান ভানুকে ধরে ফেলে দারোগা। কিন্তু একেবারে নিকেশ না করে মেরে মেরে একটা মাংসের দলাতে পরিণত করে। এরপর অনেকবার আত্মহত্যা করতে চেয়েও ভানু আত্মহত্যা করতে পারে না। শেষপর্যন্ত থানার বারান্দারই একটা অংশ তার আশ্রয় হয়ে ওঠে। সেখানেই একদা ঘোর শত্রু ভানুর সঙ্গে যতীনের একটা সহমর্মিতার সম্পর্ক গড়ে ওঠে। একসময় মালতীর প্রতি নেপালের মুগ্ধতার সম্পর্ক ছিল। সেটার জন্যেও হয়তো অমীমাংসিত খুনের রিপোর্টের অজুহাতে নেপালকে হয়রানি করিয়েছিল যতীন দারোগা। কিন্তু দিনের পর দিন ভানুর দলাপাকানো চেহারাটা দেখতে দেখতে নিজের কৃতকর্মের জন্যে অনুতপ্ত হয় যতীন দারোগা। তাই হয়েতো মালতীকে রাখার ফ্ল্যাটে নেপালকে দেখেও যতীন রেগে ফেটে পড়ে না। বরং নেপালের হাত দু'খানা ধরে ক্ষমা প্রার্থনা করে। যে নারীর জন্য এতকিছু সেই যেন শেষে অস্তিত্বহীন হয়ে যায়।

শান্তিনিকেতনকে পটভূমি করে শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় দ্বিতীয় উপন্যাস হলো 'টানেলের ভেতরে ট্রেন' (১৯৮৬)। কয়েকটি পরিবারের টুকরো টুকরো কাহিনি জুড়ে দিয়ে কাহিনি নির্মাণ করা হয়েছে। অর্জুনকিশোর রায় ও বিমলা রায়ের একমাত্র সন্তান বাবলু ওরফে অরুণকুমার রায়। পন্ডিচেরি থেকে বোলপুরে এসে নিজের ছেলেকে শ্রীনিকেতনে ভর্তি করে দেয় এবং নিজেরা ঘর ভাড়া করে থাকে। সময়ের আগেই অবসর নিয়ে অর্জুনকিশোর টাকা ব্যাংকে রেখে সুদ নির্ভর মাসিক আয়ে সংসার চালান। মোহিত দত্ত কলেজে ইতিহাস পড়ায়— সেও অবসরের দোরগোড়ায়। তার স্ত্রী হেনা দত্ত কলেজে সংগীত শেখায়। ভুজঙ্গ চৌধুরীর বিভিন্ন ক্যান্টিনে খাবার সাপ্লাই দেবার ব্যবসা আছে। থাকেন কলকাতায় কিন্তু তার মেয়ে মাধুরী শান্তিনিকেতনে হোস্টেলে থেকে পড়াশোনা করে। অর্জুনের অন্যতম চিন্তা যদি বেশিদিন বাঁচে তাহলে একদিন জমানো টাকা শেষ হয়ে যাবে— তাই যেন হিসেব করে সেরিব্রাল অ্যাটাকে মারা যান। অন্যদিকে ভুজঙ্গ চৌধুরী ব্যবসায় মার খেয়ে বিশাল ঋণের জালে জর্জরিত হয়ে ট্রেনের বাথরুমে আত্মহত্যা করে। মাধুরী অসুস্থ হওয়ায় কলকাতায় ফিরে যায়। অরুণও বাবার মৃত্যুর পর মা'কে নিয়ে কলকাতায় চলে যায়। যে সময়ের কথা বলা হচ্ছে বিশ্বভারতীতে তখন রামকিঙ্কর বেইজ কাজ করেন। এছাড়াও আছে ইউ. জি. সি. প্রফেসার দ্বিজেন ঘোষ ও তার স্ত্রী শক্তি, দুই মেয়ে রিনি ও পুষি ওরফে পারিজাত ঘোষ ও দ্বিজেনের শ্বশুরমশাই। অবিনাশ ও তার পাগল স্ত্রী ও ছেলে সুদীপও কাহিনির মধ্যে জড়িয়ে আছে। অরুণের সঙ্গে পুষির ও সুদীপের সঙ্গে রিনির একটা ভালোবাসার সম্পর্ক গড়ে ওঠে। মাধুরী উপায়ন্তর না দেখে রক্ষিতা হয়। অরুণ কলকাতা চলে গেলেও পুনরায় শান্তিনিকেতনে পুষির কাছে ফিরে আসে। এই রকম বিভিন্ন রকমের পরিবারের টুকরো টুকরো ছবি নিয়ে এই উপন্যাসের কাহিনি নির্মিত হয়েছে।

'ভোরবেলার ভালোবাসা' (১৯৯০) উপন্যাসেও লেখক আত্মজৈবনিক উপাদান ব্যবহার করেছেন। এখানে মানিকলাল মিত্রের মধ্যবয়সের বিভিন্ন সমস্যা এবং তা থেকে মুক্তি পেতে কারও কাছে আশ্রয়প্রার্থী হবার আকুল প্রচেষ্টা দেখা যায়। মাঝবয়সে এসে মানিকলালের ক্ষোভ হয়েছে, কেন আগের মত— কেন সেই যৌবনের মত সবকিছু হচ্ছে না। কারণ শিল্পীর কাছে বয়স তো নেহাত সংখ্যা মাত্র। কিন্তু চারপাশের মানুষজন এমনকি পরিবার-প্রিয়জন আঙ্গুল তুলে তার বয়স হয়ে যাওয়াটা দেখাচ্ছে। মানিকলালের কষ্ট হলো, এই বিষয়টা কিছুতেই স্বীকার করতে সে পারছে না। তাই এমন কারও কাছে আশ্রয় পেতে চায় যে তাকে নতুন করে জাগাবে, নতুন উদ্যম আসবে উপন্যাস লিখতে— নতুন কিছু বানাতে। 'দৈনিক সুপ্রভাত' খবরের কাগজে কাজ করা মানিকলালের অন্বেষণ চলতেই

থাকে— এরমধ্যে তার পরিচয় হয় তারই লেখার এক গুণমুগ্ধ পাঠিকা বছর চব্বিশের জয়শ্রী পালিতের সঙ্গে। ত্রিশ বছরের দাম্পত্যে প্রায় বিশ বছর স্ত্রী বেলার সঙ্গে রুমমেটের মত কাটিয়ে লেখক মানিকলাল মিঠু ওরফে জয়শ্রীর মধ্যে তার কাঙ্ক্ষিত আশ্রয় খুঁজে পায়। কিন্তু সে অনুভব করে জয়শ্রীর সামনে একটা দীর্ঘ জীবন পড়ে আছে। তাই জয়শ্রীর পুরানো প্রেমিক সুব্রত মজুমদারকে অনুরোধ করে জয়শ্রীর সঙ্গে সম্পর্ক না ভাঙতে। নিজেদের মধ্যে ঘটা সব ভুল বোঝাবুঝির অবসান করে যেন সুব্রত জয়শ্রীকে আবার আপন করে নেয়। মানিকলালের অনুভবে জয়শ্রীর প্রতি প্রেম অপেক্ষা যেন জয়শ্রীর প্রতি কর্তব্য বড় হয়ে ওঠে। কিন্তু সুব্রত মানিকলালের অনুরোধে রাজি হয় না। প্রেম ও কর্তব্যের স্বরূপ উন্মোচন করেছেন লেখক এই উপন্যাসে।

হাইকোর্টের বিচারক শরদিন্দু 'দূরবীনের উল্টোদিকে' (১৯৮২) উপন্যাসের প্রধান চরিত্র। মানুষের চরিত্রের মধ্যেই কত বৈপরীত্য রয়েছে তা শরদিন্দুকে না দেখলে বোঝা যায় না। যে বিচারক ধর্ষণের দায়ে দুই অভিযুক্তকে দোষী সাব্যস্ত করে ফাঁসির আদেশ দেয়, সেই বিচারকই বাড়ি ফিরে যুবতী পরিচারিকা রানীকে দেখে নিজের কাম-প্রবৃত্তি নিয়ন্ত্রণে রাখতে না পেরে ধর্ষণ করে। অবশ্য পদ- ক্ষমতা প্রবৃত্তির নিয়ন্ত্রণ হারানোটা ত্বরান্বিত করেছে। যদিও শেষপর্যন্ত লোকেরা পঞ্চায়েতের মাধ্যমে শরদিন্দুকে জরিমানা দিতে বাধ্য করেছে। 'এখানে বিরাজি শুয়ে আছে' (১৯৯৪) উপন্যাসে বারাঙ্গনা বিরাজির জমি কিনে উকিল মোহিত বাগচি বাড়ি করে। একদিকে উকিলের পসার, প্রভাব-প্রতিপত্তি, অর্থ বৃদ্ধি পেতে থাকে অন্যদিকে বিরাজির বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বিরাজির ব্যবসাতে মন্দা আসে। উকিলের নামেই সেই জায়গার নাম হয় মোহিতনগর। মোহিত বাগচির বাড়ির পাশে একজন বিগতযৌবনা বারাঙ্গনার বাড়ি থাকবে— এটা যেন সেই জায়গার ক্ষেত্রে খুব অসম্মানজনক। কিন্তু বিরাজিও উঠে যেতে রাজি হয় না। এই বিবাদমান অবস্থায় একদিন বিরাজি নিজের পেটের ভাত জোগাড় করার জন্য একজোড়া অনন্ত (অলংকার বিশেষ) বিক্রি করতে গিয়ে নিখোঁজ হয়ে যায়। অনেকদিন পরে মোহিতের মৃত্যুর পর মোহিতের নাতি সৌরভের সামনে বাড়িটির প্রাচীন প্রাচীর ভেঙে পড়ে। সে দেখে ভেতরে দুমড়ানো-মোচড়ানো একটা কঙ্কাল—যার হাতে ধরা আছে একজোড়া অনন্ত। 'বেঁচে থাকার স্বাদ' (১৯৯৮) উপন্যাসে একজন কৃষকের কাছে ও তার পরিবারের কাছে জমির টান কতটা বড়, তাই দেখানো হয়েছে। গ্রাম বা শহর, শোষক শ্রেণির যে সর্বত্র উপস্থিতি—এই বিষয়টিও উপন্যাসে উঠে এসেছে। মহাজনের শোষণে চাষি বীরেন তার স্ত্রী তরলা ও দুই মেয়ে আঙ্গুরবালা ও শিশুবালাসহ দক্ষিণ সাহসপুর গ্রাম থেকে উঠে আসে ঝাল্লার মাঠের ঝুপড়িতে। সকলের

কাজ বদলে গেলো কিন্তু জমির টান, গ্রামের বাড়ির টান বদলানো না। গ্রামের মহাজনের ঋণ শোধ করার জন্য তরলা তার মনিবের কাছে চড়া সুদে ঋণ করে। ফলে এখানেও তারা শোষিত হয়। অসহায় মানুষকে শোষণ করার জন্য যেন এভাবেই নানা জায়গায় ফাঁদ পাতা থাকে।

'মাছের পেটে আংটি' (১৯৮৬) উপন্যাসে পুরানো প্রেমিক অশেষ, পুরানো প্রেমিকা দীপা ও তার মেয়ে সংঘমিত্রাকে কেন্দ্র করে ভালোবাসার এক অন্য রূপ তুলে ধরেছেন লেখক। অশেষ ও দীপা নিজেদের প্রণয়কে চাপা দিয়ে নিজেদের সংসারে যথাক্রমে স্বামী ও স্ত্রী হিসাবে মানিয়ে নেয়। কিন্তু দীপার কুমারী মেয়ে সংঘমিত্রা মায়ের পুরানো চিঠিপত্র ঘেঁটে মায়ের পুরানো প্রেমের কথা জানতে পারে। তারপর মা-মেয়ে ও অশেষকে কেন্দ্র করে ভালোবাসার এক নতুন আখ্যান বুনে চলেন শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়। 'বেঁচে থাকার স্বাদ' উপন্যাসের মত 'অতি বড় ঘরণি' (১৯৮৬) উপন্যাসেও শোষণের সেই রূপ ফুটে উঠেছে। গ্রাম ছেড়ে শহরে আসতে বাধ্য হওয়া মানুষের কাহিনি এর বিষয় হয়ে উঠেছে। 'বাম অলিন্দ' উপন্যাসে যে প্রকৃতি-সচেতন নিরঞ্জন বোসকে পাই, সেই চরিত্রই রূপান্তরিত হয়ে যেন প্রকৃতির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত চরিত্র পাই 'ভগবান বুনো রায়ের বংশধর' (১৯৮৯) উপন্যাসে মহেশ্বর প্রসাদ রায়কে। যিনি বড় হয়ে উঠতে উঠতে প্রকৃতির কাছ থেকে প্রকৃতির শিক্ষালাভে অভিজ্ঞ হয়ে ওঠে। মহেশ্বর বিভিন্ন জায়গার খ্যাতনামা উদ্ভিদ বিজ্ঞানীরা মহেশ্বর প্রসাদের কাছে পরামর্শ নিতে আসে। বিভিন্ন উদ্ভিদের মধ্যে সংমিশ্রণ ঘটিয়ে তৈরি করে নানা রকমের হাইব্রিড ফল বা ফুল। বছর আশির মহেশ্বর যেন মানুষরূপী প্রকৃতি হয়ে উঠেছেন। তাই তার আরেক নাম বুনো রায়। প্রকৃতি যেমন চির নতুন ঠিক তেমনি বুনো রায়ও যেন চির নতুন। তিনি সাইকেল নিয়ে দূর-দূরান্তে পাড়ি দেয় নতুন কোন বীজ বা ফলের সন্ধানে। নিজের হাতে তৈরি করা বাগানটির বিক্রি হওয়া আটকাতে তিনি আদালতের শরণাপন্ন হন। প্রকৃতি-পরিবেশ রক্ষা করার জন্যই যেন মহেশ্বর প্রসাদ রায়ের এই পৃথিবীতে আগমন হয়েছে। এই চরিত্রের একেবারে বিপরীত মেরুর চরিত্রের দেখা পাই 'হননের আয়োজন' (১৯৯৪) উপন্যাসে। শ্বশুর নেপালচন্দ্র সাধু খাঁ তার পুত্রবধূর জন্য নিখুঁতভাবে তৈরি করে হননের আয়োজন ক্রিয়া। প্রথমে পুত্রবধূকে পাগল সাজানোর চেষ্টা। কারণ এই অবস্থায় তাকে খুন করলে মানুষ ও আইন যাতে ভাবে এক পাগলের মৃত্যু হয়েছে পাগলামির জন্য। অবশেষে নেপালচন্দ্র তার পরিকল্পনায় সফল হয়। কলকাতা থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে নিখুঁতভাবে সম্পন্ন করে হননের আয়োজন। 'সে' (২০০১) উপন্যাসে লেখক সত্তর বছরের বৃদ্ধের স্মৃতিচারণ তুলে ধরেছেন। দেশভাগের আগের জীবন ও পরবর্তী জীবনের ছবি এই উপন্যাসে পাই। জীবনে এতটা বছর পার

করে আসার পর যখন জীবনরস টানার শক্তি বা ইচ্ছা কোনোটাই থাকে না তখন তার স্মৃতিতে ভেসে ওঠে মায়ের কাছে শোনা বড় পিসেমশাইয়ের বাহাদুরির নানান কর্মকাণ্ড। জীবনরসের রসিক মোহিনী দাদার কাহিনি। এই সব স্মৃতি তাকে সত্তর বছর বয়সেও 'তলানিশুদ্ধ জীবনরস' টেনে নিতে সাহায্য করে। সে সর্বদা অনুভব করে তাকে যে কোনও বিপদ থেকে বাঁচানোর জন্য তার পাশে কম্বল ঢাকা দিয়ে আছে তার মহাশক্তিমান বড় পিসেমশাই। তাই বিপদের তোয়াক্কা না করে নানান রকমের অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ে এগিয়ে যায় সে।

'কন্দর্প দর্পণ' (১৯৯৪) উপন্যাসটি তুষার, মহুয়া ও তপতীর সম্পর্কের কাহিনি। সম্পর্ক ভেঙ্গে পড়ার ও নিজেদের ভেঙ্গে যাওয়ার কাহিনি। সারাজীবনই তুষার এক সুন্দর মুখ খুঁজেছে, পেয়েওছে কিন্তু তবু সুন্দর মুখের আকাঙ্ক্ষা তার মেটেনি। মহুয়াকে ভুলে তপতীকে আপন করার জন্য ধর্মান্তরিত হওয়া, আবার মহুয়ার স্মতি ভুলতে না পারা, সবাইকে নিয়ে একসঙ্গে থাকতে চাওয়ার অভিলাষ পূরণ হয়নি তুষারের। বাঁধ সেধেছে তুষারের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা নারীরা— স্ত্রী, প্রেমিকা, কন্যা (শিখা)। দু-দিক সামলাতে গিয়ে টালমাটাল হয়েছে তুষারের নিজের অস্তিত্ব। বোঝাতে পারেনি তপতীকে ও শিখাকে। শেষে যখন ছোট দুটি-হাতকে (তুষার আর তপতীর ছোট মেয়ে সোমা) তুষার আঁকড়ে ধরতে চেয়েছে, অস্বীকার করেছে সোমাও। আসলে জীবনের উপান্তে এসে সে বুঝেছে সে বড় একা। কোথায় ফিরে যাবে সে? সব পথ, সব দরজা আজ রুদ্ধ।

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় 'শিকড়' (১৯৯৭) উপন্যাসটিতে দুই ভাই রতন আর তপন গুহরায়ের কাহিনি দেখাতে গিয়ে এসেছে নানা প্রসঙ্গ। 'যোগফল' কাগজের সম্পাদক রতন, জগৎ পালিতের সাক্ষাৎকার নিতে এসে শোনায় নিজের জীবনের গল্প। দুই ভাই দু-মিনিটের ছোট-বড় হওয়ার পরও এক বিরাট ফারাক রয়ে গেছে দুজনের মধ্যে— এই নিয়েই কাহিনিটির বিষয়বস্তু এগিয়েছে। যেখানে রতন তার কাগজের ব্যাপারে মনোযোগী অন্যদিকে তপন খুঁজে চলেছে তার শিকড়। তপনের গ্রহরত্নের কমিশন এজেন্ট হয়ে ঘুরতে ঘুরতে মনে হয়, সে নিজেই ভাগ্য বিচার করার ক্ষমতা আয়ত্ত করতে পেরেছে। ফলে সে নিজের বিচার করে মানুষকে সঠিক পাথর দিতে পারবে। ফলে তপন গ্রহ-রত্নের জগতে আরও তলিয়ে যায়। এই উদ্দেশ্যেই তপনের কনখল যাওয়া। বাশরির সবকিছু ছেঁড়ে বেনারসে পূর্ণার্থীদের চিকিৎসা করা, জগৎ পালিতকে নতুন করে অনুভব করায় যে সবাই নিজের জায়গায় ভালো আছে। ঊর্মিলার সামনে দুজনের বাস্তব অবস্থা শেষে এসে ধরা পরে যাওয়ায় এক আবছা অন্ধকারে স্পষ্ট হয়ে যায় প্রত্যেকের বাস্তবতা।

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'শাহজাদা দারাশুকো' (১৯৯৭) উপন্যাসের ভূমিকা বলতে পারি 'একটি ঐতিহাসিক উপন্যাসের ভূমিকা' উপন্যাসটিকে। কাহিনির শেষে এসে সমরেন্দ্রনাথ বসুর (সমর) নিজেকে মনে হয়েছে দারা আর ইরা হয়েছে রানাদিল। শুভ্রর ভালোবাসাকে প্রত্যাখান করে ইরা কাছে এসেছে সমরের। ঝকঝকে এই তরুণীর কাছে এসে সমরের হীনমন্যতাবোধ জেগে উঠেছে। নিজের অযোগ্যতা, অক্ষমতা যেন আরও বেশি উলঙ্গ হয়ে বেরিয়ে পড়েছে। কিন্তু তবুও শিল্পকে কে না ভালোবাসে! যদিও তার মনে হয় সে শুধু এই শিল্পের একটি জিনিস মাত্র। সমরের মতে নারীরা অবলীলায় আগুন হ্যাণ্ডেল করতে পারে আর ইরাও এই আগুনে ঝাঁপ দিয়ে শেষে বুঝতে পারে আগুনে শুধু পুড়ে যেতে হয়। তাইতো সব ভালোবাসা আজ ভোগ বলে মনে হয় তার। সমর সবাইকে নিয়ে একসঙ্গে থাকতে চাইলেও শিপ্রা আর ইরা কেনই বা রাজি হবে ভাগে? এই বিষয়টি অনেক উপন্যাসেই দেখা গেছে শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের। নতুন করে লিখতে গিয়ে সমরের লেখায় ফিরে আসে দুই নারীর শুকনো কথা। পড়া পড়া দিয়ে খেলা শুরু হয়েছিল— পরবর্তীকালে ক্রমাগত বেড়ে চলা বিবাদ, মতান্তরে খেলার সব আনন্দ শুষে নেয়। ফলে সমর-ইরার সম্পর্ক উদ্‌গীরণ করতে থাকে বিষ। দারার (সমরের) নিজেকে রানাদিলের (ইরার) সম্পত্তির তহশীলদার বলে মনে হয়। শেষপর্যন্ত সব আনন্দখেলা তীব্র যন্ত্রণায় পর্যবসিত হয়েছে।

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'মাতৃচরিতমানস' (২০০৪) উপন্যাসটি একটি সুখী পরিবার জীবনের কাহিনি হয়ে উঠত যদি তাদের মধ্যে অসিতে আগমন না ঘটত। কাহিনির নারীদের অসিতের কাছে আসা এবং যৌবনকে দ্বিতীয়বার অনুভব করা এর মূলে। সত্যপ্রসন্ন তালুকদার এবং তার স্ত্রী আভারাণীর ভরা সংসার পুত্র অরুণ, বরুণ ও তাদের স্ত্রী সরমা, রুবি আর নাতি কৌশিককে নিয়ে। এসরাজ শিল্পী আভা এবং তারই ছাত্র অসিতের সম্পর্ক বদলে দেয় রুবি আর সরমার ভাবনাধারাকে। আমরা প্রত্যেকে ভালোবাসা প্রত্যাশা করি এবং প্রতিটি নারীরই সেই অধিকার থাকা উচিৎ বলে মনে হয় তাদের। এই কারণে রুবির হিংসে হয় মাঝে মাঝে; অসিতের সামনে বরুণের লাউ-এর মতো পেট, যেটার ওজনে রুবি হাঁসফাঁস করে। রুবি বরুণের ভালোবাসায় কোনও গন্ধ পায় না। কারণ রুবির মতে, দুটি মানুষের মধ্যে প্রকৃত ভালোবাসার সম্পর্ক সৃষ্টি হলেই পরস্পর পরস্পরের গন্ধ পায়। অথচ সে দেখেছে আটচল্লিশের আভার রূপ, এই বয়সেও আভার শরীরে সুঠাম খাঁজ। মৃত্যুর পরেও আভা যেন জিতে গেছে নারী হিসেবে, প্রকৃত ভালোবাসা পাওয়া মানুষ হিসাবে। সবার চোখে সারাজীবন থেকেছেন অ্যাট্রাক্টিভ। তাই অসিতও বারবার এসেছে আভার কাছে। উপন্যাসের শেষে সরমা যাকে এতদিন

কঠিন বলে মনে হয়েছে সেও ভেঙে পড়েছে অসিতের কাছে। এতদিনের একরোখা খটখটে সম্পর্ক ভালোবাসা পাওয়ার দাবিতে কম্পমান। সরমা ডানা মেলেছে নতুন আস্বাদে; আত্মসমর্পণ করেছে রুবিও।

জীবনকে ভেঙে চুড়ে দেখার কাহিনি 'সিদ্ধকামিনী' (১৯৮৪) উপন্যাসটি। যৌথ পরিবারের সদস্য পার্থ (পার্থসারথি দত্তগুপ্ত) পরিবার আর জীবনকে দেখেছে নানারূপে। যেখানে কনস্টেবল পুত্র হিসাবে গর্বিত ছেলে দেখেছে প্রমোশান পাওয়া ঘুষখোর বাবাকে। মাসি সম্পর্কের নারীর সঙ্গে জড়িয়ে পরেছে সে নিজে এবং জড়াতে দেখেছে নিজের বাবাকেও। নিজেদেরকে (বাবা ও নিজে) তার মনে হয়েছে দুটি কুকুর, মধ্যে ফারাক ছিল শুধু কয়েকটি তক্তার। পড়াশুনায় প্রথম সারির পার্থ নিজেকে দেখেছে খোকন হতে আবার খোকন কীভাবে হয়ে উঠেছে পার্থ। শুধু সময় বদলে দিয়েছে জীবনখাতকে। তীব্র অস্তিত্ব সংকটে পার্থ বিশ্বাস করেছে অলৌকিকতাকে। উপন্যাসে দেখা মিলেছে আগমবাগীশ তন্ত্রসাধক ঝাঁপা দিশী নিয়ে কারণ সঙ্গ করেছে আর মাসীও সেই বিশ্বাসে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছে পার্থকে। পার্থর মনে হয়েছে, ''পৃথিবীতে মেয়েলোক, বিষয়-সম্পত্তি সবই তো সঙ্গ, অর্জন, অধিকারের নামে এক ধরনের খোয়াড় প্রথা।''[৩৬] কিন্তু জীবনের খেলায় সে নিজেই বলি হয়েছে এই খোয়াড় প্রথায়। তাই শেষে যখন বুঝেছে তখন আত্মসমর্পণ করেছে জীবনের কাছে, স্বীকার করেছে সমস্ত লজ্জা নিজের প্রতি নিজের মনে। পার্থ বিয়ে করতে রাজী হয়েছে মাধবীকে। 'এক গেরস্থর তিন সংশয়' (১৯৮০) উপন্যাসটি বীরেন আর রাধার কাহিনি। কলকাতার আন্ডারগ্রাউন্ডে কিলবিল করা অসংখ্য পোকাদের নিয়ে চিন্তিত বীরেনের ভাবনার কাহিনি এই উপন্যাসে। বীরেন এ ব্যাপারে সর্বদা চিন্তিত হলেও রাধা ছিল অন্যরকম, বাড়িতে থেকেও কখনও সে পোকাগুলোকে মারেনি। কিন্তু বীরেনের সর্বদা মনে হয়েছে, পোকাগুলো ক্রমশ যেন মাটি ফুঁড়ে উপরে উঠে আসছে। তীব্র সংশয় বীরেনকে বারবার চিন্তিত করেছে। তার জীবনে আর এক বড় সংশয় ভালোবাসা, যার সংজ্ঞাটা দুজনের (বীরেন ও তার স্ত্রী) কাছে ভিন্ন ভিন্ন। সে কোনও দিনই তার ভালোবাসা রাধাকে বোঝাতে পারেনি। বীরেনের মনে হয়েছে সামান্য আরশোলা আর চারটি ছুঁচোকে যে এখনও বিষ দিয়ে সাবাড় করতে পারে না এবং শেষে নিজেকেই যে সাবাড় হতে হবে, একথা রাধা বুঝবে কী করে! যে রাধা ''তার শরীরের কোষগুলি বিশেষ বিশেষ সময়ে সন্তুষ্ট না হইলে তার প্রতি আমার যতই ভালবাসা থাকুক না কেন— সব মিথ্যা হইয়া যায়।''[৩৭] সেই রাধাকে বীরেন ভালোবাসার কথা বোঝাবে কী করে! আর এরকম পরিস্থিতিতে তীব্র অস্তিত্ব সংকট, নিশ্চিন্ত আশ্রয়ের খোঁজ— সব মিলিয়ে বেঁচে থাকাটাই

যেন আরও বেশি সংশয়ের। তাই বীরেন হয়ত আর ফেরেনি বা ফিরতেও চায়নি। আসলে যে পোকাটা তার মাথার ভিতরে সর্বদা কিলবিল করছিল তাকে সে মারবে কোন বিষ দিয়ে? শুধু রাধা বা কর্ণেল নয়, আসলে আমরা প্রত্যেকেই 'গুপ্ত পাগল।'

তথ্যসূত্র:

১. গঙ্গোপাধ্যায় শ্যামল, 'আমার লেখা', রচনা সমগ্র-১, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ: জুলাই ২০১১, পৃ. ১২-১৩

২. গঙ্গোপাধ্যায় শ্যামল, 'কুবেরের বিষয় আশয়', রচনাসমগ্র-১, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ: জুলাই ২০১১, আষাঢ় ১৪১৮, পৃ. ৩৫৩।

৩. গঙ্গোপাধ্যায় শ্যামল, 'অনিলের পুতুল', রচনাসমগ্র-১, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ: জুলাই ২০১১, পৃ. ২৭৭।

৪. গঙ্গোপাধ্যায় শ্যামল, 'গঙ্গা একটি নদীর নাম', বুক ফ্রন্ট, পাবলিকেশন ফোরাম, কলকাতা-৯১, প্রথম প্রকাশ: কলকাতা বইমেলা ১৪০৭, জানুয়ারি ২০০১, পৃ. ১২।

৫. গঙ্গোপাধ্যায় শ্যামল, 'নির্বান্ধব', রচনাসমগ্র-২, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ: জুলাই ২০১১, আষাঢ় ১৪১৮, পৃ. ৬৪।

৬. গঙ্গোপাধ্যায় শ্যামল, 'পরস্ত্রী', রচনাসমগ্র-২, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ: জুলাই ২০১১, আষাঢ় ১৪১৮, পৃ. ১৫০।

৭. গঙ্গোপাধ্যায় শ্যামল, 'সরমা ও নীলকান্ত', রচনাসমগ্র-৩, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ: এপ্রিল২০১২, পৃ. ৪৬।

৮. তদেব, পৃ. ৬১-৬২

৯. গঙ্গোপাধ্যায় শ্যামল, 'সতী অসতী', রচনাসমগ্র-৩, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ: জুলাই ২০১২,পৃ. ১২৫।

১০. গঙ্গোপাধ্যায় শ্যামল, 'তিন সম্পাদক', 'অদ্য শেষ রজনী' উপন্যাসের ভূমিকা অংশ, রচনাসমগ্র-৩, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ: জুলাই ২০১২।

১১. গঙ্গোপাধ্যায় শ্যামল, 'ঈশ্বরীতলার রূপোকথা', রচনাসমগ্র-৪, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ: জুলাই ২০১৩, আষাঢ় ১৪১৮, পৃ. ১৯-২০।

১২. তদেব, পৃ. ৮৫

১৩. গঙ্গোপাধ্যায় শ্যামল, ‘পরীর সঙ্গে প্রেম’, উপন্যাসের ভূমিকা অংশ, রচনাসমগ্র-৪, দে’জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩,

১৪. গঙ্গোপাধ্যায় শ্যামল, ‘পরবর্তী আকর্ষণ’, রচনাসমগ্র-৪, দে’জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ: জানুয়ারি ২০১৩, পৃ. ৩৬৬।

১৫. গঙ্গোপাধ্যায় শ্যামল, ‘চন্দনেশ্বর জংশন’, রচনাসমগ্র-৫, দে’জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ: জানুয়ারি ২০১৪, পৃ. ১৭৭।

১৬. গঙ্গোপাধ্যায় শ্যামল, ‘স্বর্গের পাশের বাড়ি’, রচনাসমগ্র-৫, দে’জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ: জানুয়ারি ২০১৪, পৃ. ৩২৭।

১৭. গঙ্গোপাধ্যায় শ্যামল, ‘মহাজীবন’, দে’জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ: কলিকাতা পস্তকমেলা, জানুয়ারি ১৯৯৫, পৃ. ১৬

১৮. তদেব, পৃ. ১০৪।

১৯. গঙ্গোপাধ্যায় শ্যামল, ‘একদা ঘাতক’, উপন্যাসের ভূমিকা অংশ, দশটি উপন্যাস, দে’জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ: জানুয়ারি ২০০৮

২০. তদেব।

২১. গঙ্গোপাধ্যায় শ্যামল, ‘কহেল গাঁও’, দে’জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ: কলকাতা পুস্তক মেলা, জানুয়ারি ২০০৪, পৃ. ১১৫

২২. গঙ্গোপাধ্যায় শ্যামল, ‘অলীক বাবু’, দশটি উপন্যাস, দে’জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ: জানুয়ারি ২০০৮, পৃ. ৩৬৪।

২৩. গঙ্গোপাধ্যায় শ্যামল, ‘হাওয়াগাড়ি’ (প্রথম খণ্ড), মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা.লি:, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ: ভাদ্র ১৩৮৬, পৃ. ১০০।

২৪. গঙ্গোপাধ্যায় শ্যামল, ‘হে মহান দিশারী’, ‘শাহজাদা দারাশুকো’ (প্রথম খণ্ড), উপন্যাসের ভূমিকাংশ, দে’জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ: কলকাতা পুস্তকমেলা, জানুয়ারি ১৯৯১

২৫. তদেব।

২৬. গঙ্গোপাধ্যায় শ্যামল, ‘শাহজাদা দারাশুকো’ (প্রথম খণ্ড), দে’জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি

স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ: কলকাতা পুস্তকমেলা, জানুয়ারি ১৯৯১, পৃ. ৪৩

২৭. গঙ্গোপাধ্যায় শ্যামল, 'মহাবিশ্বের মহা কলরোল', 'শাহজাদা দারাশুকো' (দ্বিতীয় খণ্ড), উপন্যাসের ভূমিকাংশ, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ: ডিসেম্বর ১৯৯১।

২৮. তদেব।

২৯. গঙ্গোপাধ্যায় শ্যামল, 'কামিনীকাঞ্চন', দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ: কলকাতা পুস্তকমেলা, জানুয়ারি ১৯৯৪, পৃ. ৭৮

৩০. গঙ্গোপাধ্যায় শ্যামল, 'ভালোবাসিব না আর', দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ: কলকাতা পুস্তকমেলা, জানুয়ারি ১৯৯৮, পৃ. ৫৫।

৩১. গঙ্গোপাধ্যায় শ্যামল, 'নয়ন', দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ: কলকাতা পুস্তকমেলা, জানুয়ারি ১৯৯৮, পৃ. ১১৯

৩২. গঙ্গোপাধ্যায় শ্যামল, 'তৃতীয় মেরু', দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ: কলকাতা পুস্তকমেলা, জানুয়ারি ১৯৯৮, পৃ. ১৬৪।

৩৩. গঙ্গোপাধ্যায় শ্যামল, 'সওদাগর', 'দশ দিগন্ত', মৌসুমী প্রকাশনী, কলকাতা-০৯, প্রথম প্রকাশ: ৬ই আগস্ট ১৯৮৬, পৃ. ৮৩৫।

৩৪. গঙ্গোপাধ্যায় শ্যামল, 'বাম অলিন্দ', 'দশটি উপন্যাস', দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ: জানুয়ারি ২০০৮, পৃ. ৪৮২।

৩৫. গঙ্গোপাধ্যায় শ্যামল, 'যতীন দারোগার বেদান্ত', করুণা প্রকাশনী, ১৮ এ টেমার লেন, কলকাতা-৯, পৃ. ৭২।

৩৬. গঙ্গোপাধ্যায় শ্যামল, 'সিদ্ধকামিনী', দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, কলকাতা পুস্তকমেলা, প্রথম প্রকাশ: ফেব্রুয়ারি ১৯৮৪, পৃ. ৭৫।

৩৭. গঙ্গোপাধ্যায় শ্যামল, 'এক গেরস্থের তিন সংশয়', দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ কলিকতা পুস্তকমেলা, ফেব্রুয়ারি ১৯৮৪, পৃ. ২১৮, ১৫৯।